মাই জার্নি : স্বপ্নকে বাস্তবতা প্রদান – এ পি জে আবদুল কালাম

অনুবাদ – রাব্বি উস সানী

বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশ – ডিসেম্বর ২০১৫

ভূমিকা

আমার বয়স এখন আশির উর্ধ্বে। আমার এই দীর্ঘযাত্রা, আমার শৈশব থেকে এখন পর্যন্ত ঘটে যাওয়া অসংখ্য অভিজ্ঞতা সম্বলিত। এই দীর্ঘসময় জুড়ে অসংখ্য অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে আমি জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটা পেয়েছি। তা হলো—সবাইকে জীবনের প্রতিটি ধাপেই স্বপ্ন দেখতে হবে। সেই স্বপ্নকে বাস্তবতা প্রদানের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। যদি কেউ এমনটা করতে পারে, তবে সাফল্য তার জন্য সময়ের ব্যাপার মাত্র। আমার পরিচিত অসংখ্য মানুষকে আমি বলেছি, 'আমরা ঘুমের মধ্যে যে স্বপ্ন দেখি, তা প্রকৃতপক্ষে কোনো স্বপ্নই নয়। স্বপ্ন হলো ঐ বস্তু যা আমাদেরকে ঘুমাতে দেয় না।

একদিন যখন আমি আমার বাগানে হাঁটছিলাম, তখন হঠাৎ করেই এই বইটি লেখার কথা আমার মাথায় আসল। বরাবরের মতোই আমি আমার বাগানের বুড়ো অর্জুনগাছটার নিচে দাঁড়িয়ে পড়লাম। গাছটার বয়স একশ'র বেশি হবে। আমি গাছটির নিচে দাঁড়িয়ে এর ডালপালার দিকে তাকালাম। আমি খুঁজছিলাম এই গাছে কোনো পাখি বাসা বেঁধেছে কি না বা নতুন কোনো জীবনের উপস্থিতি আছে কি না। আর এরকম একটি মুহূর্তে যখন আমি গাছের দিকে তাকিয়ে আছি, তখন আমার বাবার কথা মনে পড়ে গেল। আমার বাবাও খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতেন।

তিনি তার বাগানের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে তার নারকেলের গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতেন। বাবার কথা ভাবতে ভাবতেই আমার মুখের কোণে হাসির রেখা ফুটে উঠল। আমার শৈশবের স্মৃতি এবং এর সাথে জড়িত মানুষগুলোর কথাও মনে পড়ে গেল। যাদের হাত ধরে আমি এতটা পথ পাড়ি দিয়েছি। এরপর আমি আমার এই দীর্ঘযাত্রার কথা স্মরণ করলাম। যে সকল পথে আমি হেঁটেছি, যে সকল ঘটনা আমি নিজের চোখে দেখেছি, আমি নিজে যে সকল ঘটনার অংশ ছিলাম, সে সকল কিছু আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আমি তখন চিন্তা করে দেখলাম এই সকল স্মৃতি এবং অভিজ্ঞতাকে আমার নিজের মাঝে রেখে দেওয়া উচিত নাকি, সকলকে জানানো উচিত। যারা আমাকে জানতে চায়। বটবৃক্ষের শাখা-প্রশাখার ন্যায় গড়ে ওঠা আমার পাঠকদেরকে।

এর আগেও আমি বেশ কিছু বই লিখেছি। সে সকল বইয়ের কোনো কোনোটাতে আমার শৈশবের সামান্য বর্ণনাও দিয়েছি। যখন আমি আমার জীবনের ঘটনা নিয়ে প্রথম বই লিখি, আমি নিশ্চিত ছিলাম না, কেউ আমাকে নিয়ে আগ্রহী হবে কি না। তবে 'মাই জার্নি' আমার অন্য সকল বইয়ের মতো না। এই বইতে আমার জীবনের ক্ষুদ্র এবং অজানা ঘটনাগুলো রয়েছে। আমি আমার বাবা এবং মাকে নিয়েও লিখেছি। কারণ এই বিরাশি বছর বয়সে এসেও আমি আমার মাঝে তাদের ভালোবাসা এবং আশির্বাদ খুঁজে পাই। তারা আমার মাঝে যে সকল গুণাবলি তৈরি করে দিয়ে গেছেন এবং তাদেরকে দেখে যে সকল সুনাবলি আমি আয়ত্ত করতে পেরেছি তা আমাকে পথ চলতে সাহায্য করেছে। তারা সেই সকল গুণাবলির মাধ্যমেই আমার মাঝে রয়ে গেছেন।

আমার বাবা, আমাকে মানুষকে বুঝতে চেষ্টা করা এবং সামাজিকভাবে সকল সমস্যা মোকাবেলার শিক্ষা দিয়েছেন। বহু বছর পর যখন আমি নিজেই জীবনযুদ্ধে সামিল তখন আমার বাবার প্রতিটি কথা আমার মনে পড়ে গেল। আমার মা যে ভালোবাসা এবং যত্ন নিয়ে তার সন্তানদের লালন-পালন করেছিলেন, তার মাঝে আমি ভালোবাসা এবং মহত্ব খুঁজে পেয়েছি। আমি আমার
জন্য আমার বোন জোহরার অসামন্য অবদানের কথাও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছি। আমার বন্ধু জালালউদ্দিনের অনুপ্রেরণার কারণেই আমি নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে বেড়িয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলাম।
ভারতের এয়ার ফোর্সের পাইলট হওয়ার স্বপ্নভঙ্গ, নানা প্রতিকূলতা এবং ব্যর্থতা-সবই আমার জন্য দরকারি ছিল। হ্যাঁ, এগুলো নিয়ে আমি এক পর্যায়ে ঠিকই হতাশ ছিলাম, তবে এমন কোনো হতাশা নেই যা হৃদয়ের কোটর সংকল্প দ্বারা দূর করা যায় না।
কিছুদিন আগে আমি আমার এক বন্ধুর সাথে আলাপ করছিলাম। আমার বন্ধুর নাম, প্রফেসর অরুণ তিওয়ারি। সে আচমকা আমাকে প্রশ্ন করে বসল, কালাম সাহেব, আপনি মাত্র একটি বাক্যে আপনার জীবনের সারাংশ বলতে পারবেন?
আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। তবে আমি বললাম, 'অরুণ, এই শব্দাংশ এবং শব্দগুলো আমার জীবনের সারাংশ বহন করে, শৈশবে সীমাহীন ভালোবাসা...টিকে থাকার লড়াই...আবারও লড়াই...তিক্ত অশ্রু...খুশির অশ্রু... অতঃপর ভরা পূর্ণিমার চাঁদের মতো সুন্দর এক জীবন'।
আমি আশা করছি, আমার গল্পগুলো পাঠকদেরকে নিজেদের স্বপ্ন উপলব্ধি করতে সহায়তা করবে, এবং তারা নিজেদের স্বপ্নকে বাস্তবতা প্রদান করতে পারবে।
এ.পি. জে আবদুল কালাম
গত দুই দশকে দেখা আমার পরিচিত
ষোল মিলিয়ন উদ্যমি যুবকদের জন্য...
ধন্যবাদ পাতা
প্রথমেই বইয়ের কথা দিয়ে শুরু করি। বইটির প্রকাশক সবুজপাতা। একদিন হঠাৎ করেই সবুজপাতার রাশেদ ভাইয়ের ফোন এলো। তিনি ফোন দিয়ে বললেন, 'সানী তোমার পছন্দের একটা কাজ আছে।' আমি আগ্রহ নিয়েই জানতে চাইলাম, কি কাজ। তিনি তারপর আমাকে বললেন. এই বইটি অনুবাদ করার কথা।
প্রয়াত এ. পি. জে আবদুল কালাম একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক এবং বিজ্ঞান জগতের একজন কিংবদন্তি। তাঁর প্রশংসা আর অবদান বলে শেষ করা যাবে না। তাঁর 'মাই জার্নি' বইটিতে তাঁর শৈশব, তাঁর পরিবার এবং তাঁর জীবনে প্রভাববিস্তারকারী কিছু মহৎ মানুষের বিবরণ দিয়েছেন। বইটি আমি ঠিক কতবার পড়েছি, তার ইয়ত্তা নেই। এ. পি. জে আবদুল কালামের মতো একজন প্রবাদ পুরুষের লেখা বই অনুবাদের সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।
এবার আসি একান্তই আমার নিজস্ব কিছু কথায়। এই দুনিয়ায় আমার সবচেয়ে আপনজন হলো মা। বরাবরের মতোই আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়ে যান এই মহীয়সী নারী, যাঁকে আমি 'মা' বলে সম্বোধন করি। তাই এই বইটির উৎসর্গ আর কাকেই বা দেবার আছে!
এই বইটির সফল অনুবাদের পেছনে অসামান্য অবদান রয়েছে, এমন কয়েকজনের কথা না বললে শান্তি পাব না। প্রথমেই আমাকে উল্লেখ করতে হবে আরিফ ভাইয়ের নাম। তিনি না থাকলে হয়তো

বইটি করা অসম্পূর্ণ থেকে যেত। এরপর আমি যে ব্যাক্তির কথা উল্লেখ করব, সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আমার বন্ধু। আমার এই বন্ধুটিও একজন সফল অনুবাদক। তার নাম মহিউল ইসলাম মিঠু। আমাকে এই লেখা-লেখির জগতে নিয়ে আসার পেছনে তার অবদান আমি কোনোদিন অস্বীকার করতে পারব না। এরপর আমি উল্লেখ করব আমার আরেক বন্ধু নিয়াজ রশীদের নাম। নিয়াজ, একাধারে আমার একজন পাঠক এবং সমালোচক এবং আমার অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস। আমার ব্যক্তিগত জীবনে বন্ধুর সংখ্যা খুবই সামান্য। আর সেই সামান্য কজন বন্ধুর মধ্যে নিয়াজ অন্যতম। আরেকজনের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। তার নাম রিফা রাফিয়া মনির। জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন উপদেশ এবং পথ বাতলে দিয়ে আমাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে আসছে। যাকে দিয়ে কথা শেষ করব, তিনি হলেন অলিভার তীর্থ সংকার। 'বেস্ট ফ্রেন্ড' উপাধিটা যদি কাউকে দিতেই হয় আমাকে, তবে
এই বন্ধুটি ছাড়া আর কারো কথা আমার মাথায় আসবে না। ধন্যবাদে যাদের নাম উল্লেখ করা উচিত ছিল, তবে আমার দুর্বল স্মৃতিশক্তির কারণে তাদের নাম ফসকে গেছে, তাদের কাছে আমি হাত জোর করে ক্ষমা চাইছি।
এবার পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চাই। এ. পি. জে আবদুল কালামের এই বইটি আপনাদের কাছে পৌছে দিতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত। আশা করি আপনারাও উপভোগ করবেন,এই প্রবাদ পুরুষের ঘটনাবহুল জীবনের কিছু কথা। নাহ! আর আপনাদের সময় নষ্ট করতে চাই না। জলদি বইটিতে ডুবে যান। সকলের শুভ কামনা করে শেষ করলাম। রাব্বি উস সানী
ঢাকা, নভেম্বর ২০১৫

আমার বাবার মর্নিং ওয়াক

মাই জার্নি : স্বপ্নকে বাস্তবতা প্রদান – এ পি জে আবদুল কালাম আমার বাবার মর্নিং ওয়াক

আমার বাবার মর্নিং ওয়াক

মাই জার্নি

আমার যতদূর মনে পরে, আমার বাবার দিন শুরু হতো ভোর চারটায়। আমার বাবার নাম জয়নুল আবেদীন। বাবা পরিবারের অন্য সবার আগে ঘুম থেকে উঠতেন। তারপর বাবা নামাজ পরতেন। বাবার নামাজ শেষ হতে হতে, পূর্বদিকে দিনের প্রথম আলো উঁকি দিত। নামাজ শেষে বাবা হাঁটতে বের হতেন। মূলত বাবা তার নারকেলের বাগানে হাঁটতে যেতেন। আমরা সপরিবারে

রামেশ্বরামে বাস করতাম। শহরটা মন্দিরকেন্দ্রিক। তাই ধর্মীয় দিক থেকে এর পরিচিতি এবং গুরুত্ব ব্যাপক। রামেশ্বরাম তামিল নাড়ু রাজ্যের একটা ছোট শহর এবং ভারতের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত। ভৌগোলিক কারণে এখানে সূর্য বেশ তাড়াতাড়ি উদয় হয়। আর আমাদের দৈনিক কার্যাবলিও সূর্য উদয়াস্ত এবং সমুদ্রের ঢেউয়ের তালে এগিয়ে যায়। মানুষের জীবনে শ্বাস-প্রশ্বাস যতটা স্বাভাবিক ব্যাপার, আমাদের জীবনের সাথে সমুদ্রের সম্পৃক্ততাও ততটা স্বাভাবিক ব্যাপার। আর এ কারণেই সমুদ্রের ঢেউয়ের উত্তাল শব্দ আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। বর্ষার দিনে ঝড় এবং সাইক্লোনের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছিল আমাদের জীবনে খুবই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার।

আমরা থাকতাম আমাদের প্রাচীন বাড়িটাতে। বাড়িটা আয়তনে বেশ বড়। বাড়িটা ইট এবং লাইমস্টোনের তৈরি। উনিশ শতকের কোনো এক সময়ে বাড়িটা তৈরি করা হয়েছিল। এই বাড়িকে কোনোদিক দিয়েই বিলাসবহুল বলা যাবে না। তবে বাড়িটাতে একটা বস্তুর অভাব কখনই দেখা দেয়নি। তা হলো “ভালবাসা”।

আমার বাবার ছোটখাট নৌকা তৈরির ব্যবসা ছিল। পাশাপাশি আমাদের একটা নারকেলের বাগানও ছিল। বাগানটা আমাদের বাড়ি থেকে মাইল চারেক দূরে হবে। আমার বাবা সকালে উঠে বেশ খানিকটা সময় সেখানেই কাটাতেন।

বাবার হাঁটতে যাওয়ার গন্তব্য মোটামুটি অপরিবর্তিতই থাকত। কোনো বিশেষ কারণ ছাড়া সে তাঁর গন্তব্য পরিবর্তন করতেন না।

হাঁটতে বের হলে বাবা প্রথমে “মস্ক স্ট্রিট”-এর রাস্তায় নামতেন। আমাদের বাড়িও ছিল ওই রাস্তায়। আমাদের এলাকার অধিকাংশ লোকই মুসলমান। আমাদের এলাকা শিব-মন্দিরের খুবই কাছে। আর এই শিব- মন্দিরের জন্যই শহরটা এত বিখ্যাত। মূল রাস্তা থেকে বাবা সরু গলি রাস্তায় নামতেন। হাঁটতে হাঁটতে সেই সরু রাস্তা থেকে আর একটা প্রশস্ত রাস্তায় উঠতেন। সেই রাস্তা দিয়েই সোজা নারকেল বাগানে যেতেন।

কেন জানি আজ বাবার কথা ভাবতে ইচ্ছা করছে। আমি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি, আমার বাবা সেই নীরব রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন। এখনও দিনের শুরু হয়নি। দিন শুরু হলেই রাজ্যের যত বোঝা সব বাবার ওপর চাপবে।

আমাদের পরিবার আকারে বেশ বড় ছিল। আমি নিশ্চিত যে আমাদের সকলের প্রয়োজন মেটাতে বাবা সবময় চাপের ওপর থাকতেন। তবে একমাত্র হাঁটতে বের হলে বাবা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতেন বলে আমার ধারণা।

আমি কল্পনা করছি, বাবা একা হাঁটছেন। সমুদ্রের নেশা ধরানো শব্দ তাঁর কানে আলোড়ন তুলছে। আকাশে কিছু দাড়কাক বাবার কাছে অভিযোগ জানাবার জন্য শব্দ করে যাচ্ছে। সেই

পাখিগুলোকেও সূর্য, বাবার মতো ভোরবেলা ঘুম থেকে তুলে দিয়েছে। বাবা হাঁটতে হাঁটতে মহান সৃষ্টিকর্তাকে তার অসীম করুণার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। ধন্যবাদ জানানো শেষ হলে বাবা তার পরিবার নিয়ে ভাবনা শুরু করে দিয়েছেন। একদম সুস্থির শান্ত মস্তিষ্কে বাবা ভাবছেন।

আমি এই দীর্ঘসময়ে কখনও বাবাকে জিজ্ঞাসা করিনি যে, তিনি যখন হাঁটতে বের হতেন তখন তার মনে কি নিয়ে চিন্তাভাবনা চলত। তবে জিজ্ঞাসা না করার জন্য আমাকে দোষ দেওয়া যায় না। আমার বয়সী একজন যুবকও তার বাবার মনের প্রতিচ্ছবি নিয়ে চিন্তাভাবনা করত কী? তবে আমি একটা ব্যাপারে নিশ্চিত। তা হলো, সেই সকালে হাঁটতে বের হওয়ার অভ্যাস বাবার ব্যক্তিত্বে বিশেষ কিছু এনে দিয়েছিল। সেই বিশেষ জিনিসটার উপস্থিতি অপরিচিতজনেরাও ধরতে পারতেন। তবে সেই বিশেষ জিনিসটা ঠিক কি তা কারোরই জানা ছিল না।

.

আমার বাবার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা খুবই সামান্য। তিনি তাঁর জীবনকালে খুব বেশি ধনসম্পদ বা বিষয়-সম্পত্তি করতে পারেননি। তারপরও আমি বলব যে আমার বাবা একজন জ্ঞানী মানুষ এবং আমার দেখা অমায়িক ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম। তাই এরকম একজন মানুষের সন্তান হতে পারায় আমি সত্যিকার অর্থেই ভাগ্যবান। আমাদের এলাকার মসজিদটি ছিল এলাকার প্রাণকেন্দ্র। আর এলাকার মানুষজন বিপদে-আপদে বাবার শরণাপন্ন হতো। তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত যে, বাবার কোনো আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে।

আমি আমার বাবার হাত ধরে মসজিদে নামাজ পড়তে যেতাম। বাবা খেয়াল রাখতেন যে, পরিবারের কারো যেন এক ওয়াক্তের নামাজও বাদ না যায়। আর আমরাও কোনোদিন এক ওয়াক্ত নামাজ কখনও অবহেলা করিনি। আমরা নামাজ পড়াকে নিজেদের দায়িত্ব মনে করতাম। নামাজ শেষ হলে আমি আর বাবা যখন মসজিদ থেকে বের হতাম, লোকজন বাবাকে ঘিরে ভিড় করত। তারা বাবার সাথে কথা বলতে চাইত। নিজেদের দুশ্চিন্তাগুলো নিয়ে বাবার সাথে আলোচনা করতে চাইত।

আমার মনে তখন প্রায়ই একটা প্রশ্ন জাগত। এইসব লোকেরা বাবার মাঝে কি এমন দেখতে পান? বাবা কোনো ধর্মপ্রচারক নন। এমনকি তিনি কোনো শিক্ষকও নন। তিনি একজন সাধারণ মানুষ, যিনি নিজের ধর্মীয় বিধি-বিধান এবং তাৎপর্য অনুযায়ী জীবননির্বাহ করছেন। আর বাবাই বা তাদেরকে কি দিতে পারছেন? তবে এখন আমি বিষয়টা অনুধাবন করতে পারি। বাবার উপস্থিতি তাদেরকে অনুপ্রেরণা দিত। তাদের মনে এক ধরনের আশার সঞ্চার ঘটাত। বাবা নামাজ পড়ে তাদের জন্য দোয়া করতেন। তারা বাবাকে পানি এনে দিত। বাবা সেই পানিতে আঙুল ভিজিয়ে সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করতেন। সেই পানি পরবর্তীতে রোগীদের পান করতে দেয়া হতো। অনেকেই সুস্থ হয়ে উঠত। পরবর্তীতে তাদের স্বজনরা এসে বাবাকে ধন্যবাদ জানাত।

এরই সাথে আবার আমার মনে কিছু প্রশ্ন উঁকি দিত। বাবা এরকম কেন করেন? এবং এত ব্যস্ততার মাঝেও বাবা কিভাবে শান্তিতে এবং মনযোগ সহকারে এত লোকের কথা শুনে, তাদের জন্য প্রার্থনা করেন?

আমার বাবা সাধারণ একজন নৌকার মালিক। জীবিকা উপার্জন তার জন্য সহজ কোনো ব্যাপার ছিল না। প্রধান ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন একটা ছোট শহরে দুবেলা খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকা মোটেও সহজ কোনো ব্যাপার নয়। তারপরও আমি বাবাকে কোনোদিন কাউকে ফিরিয়ে দিতে দেখিনি। কেউ বাবার সাহায্য চাইলে বাবা অবশ্যই তার সাহায্য করতেন।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, আমার বাবা আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন একজন মানুষ ছিলেন। আমার ধারণা তিনি এমনটা হতে পেরেছিলেন স্বশিক্ষিত হওয়ার কারণে। জগত এবং জীবন সম্পর্কে তার অগাধ জ্ঞান ছিল। তিনি তাঁর এই জ্ঞানের মাধ্যমে সত্য খুঁজে বের করতে পারতেন। আমি যখনই তাকে কোনো প্রশ্ন করতাম, তিনি খুব সহজভাবে তার ব্যাখ্যা দিতেন। সেই ব্যাখ্যা সঠিক এবং যৌক্তিক।

এরপর বাবা প্রার্থনা নিয়ে কথা বলতেন। মানুষের জীবনে প্রার্থনার গুরুত্ব এবং প্রার্থনার ক্ষমতা নিয়ে। বাবা বলতেন যে মানুষের কখনোই অপরের সাহায্যের ওপর নির্ভর করা উচিত নয়। সবাইকেই ভাগ্যের পরিচালিত ভিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি, যে দৃষ্টিভঙ্গি আমাদেরকে পরিপূর্ণতার পথে নিয়ে যায়, তার মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে হবে। যখন বিপদ আসে তখন বিপদকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। বিপদ আসার প্রাসঙ্গিকতা বোঝার চেষ্টা করতে হবে। কারণ, প্রতিকূলতা সবসময় নিজেকে উপলব্ধি করার সুযোগ করে দেয়।

আমার নিয়তি আমাকে বহু প্রতিবন্ধকতা এবং পরাজয় উপহার দিয়েছে। আমি আমার জীবনের সেই প্রতিবন্ধকতা এবং পরাজয়ে বাবার এই উপদেশ মেনে চলেছি। তাই আমি সব সময়ই নতুন করে শক্তি খুঁজে পেয়েছি। আমি রামেশ্বরাম থেকে বহুদূর পাড়ি দিয়েছি। আমার গন্তব্য আমাকে বহু জায়গায় নিয়ে গেছে। জেট ফাইটার প্লেনের ককপিঠ থেকে দেশের সর্বোচ্চ অফিসে পৌছাবার কথা আমি কোনোদিন কল্পনাও করিনি। এই দীর্ঘযাত্রার প্রতিটি মুহূর্তেই বাবার কথাগুলো বারবার আমার কাছে ফিরে এসেছে।

যখনই আমি উদ্বিগ্ন থাকি, আমি আমার বাবার কথা চিন্তা করি। বাবাকে কল্পনা করি। আমার কল্পনায় বাবা আমাকে বলেন, “আমাদের ওপর এক ধরনের স্বর্গীয় শক্তির আশির্বাদ রয়েছে। সেই স্বর্গীয় আশির্বাদের কারণেই আমাদের যত দুঃখ, ব্যর্থতা, হতাশা এবং বিপদ-আপদ কেটে যায়। আমরা যদি সেই শক্তির কাছে নিজেদের মনকে উন্মোচন করে দেই, তবে এই স্বর্গীয় ক্ষমতা আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দেবে। সেই নির্দেশনা অনুসরণ করে আমার নিজেদের গন্তব্যে পৌছাতে পারব। নিজেকে সকল বাঁধা থেকে মুক্ত করে দাও। এই শক্তির কাছে নিজেকে সমর্পণ কর। তুমি ঠিকই শান্তি এবং সুখ খুঁজে পাবে।

.

আমার বয়স এখন বিরাশি। বাবার মতো আমিও আমার দিন শুরু করি হাঁটার মধ্য দিয়ে। প্রতিদিন ভোরে আমি সূর্যের প্রথম আলোর স্বাদ নেই। উপভোগ করি সূর্যকে জায়গা দেয়ার আগে আকাশ যে আলো দিয়ে নিজেকে সজ্জিত করে সেই আলোকে। মৃদু বাতাস এবং পাখির ফিসফিসানি শুনে এর অর্থ বোঝার চেষ্টা করি। এই সময়টা, কি করে আমাদেরকে প্রকৃতির সাথে এক করে দেয় তা এখন আমি বুঝতে পেরেছি।

প্রতিটি সকালই আলাদা। কারণ যে জিনিসগুলোর জন্য ভোরবেলা বিশেষ একটা সময়, সেই উপাদানগুলো প্রতিবার ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়। প্রকৃতিও নাটকীয়তা পছন্দ করে। আর আমি সেই নাটকীয়তা দেখে প্রতিনিয়ত মুগ্ধ হই। তবে বাবার মতো আমার প্রতিটা সকাল এক স্থানে কাটে না। আমার কাজের জন্য প্রায়ই আমাকে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। তাই প্রায় সকালেই আমি নিজেকে ভিন্ন ভিন্ন শহরে আবিষ্কার করি। তবে ভোরের মাঝে যে শান্তি এবং নীরবতা বিদ্যমান তা সব জায়গায়ই এক থাকে। যেমন, আমি যেখানেই থাকি না কেন, আমি একটা বয়স্ক গাছ ঠিকই খুঁজে পাব। সেই গাছে খুঁজে পাব অনেক পাখির বাসা। পাখিরা নতুন দিনের সূচনা করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। সকালের মৃদু বাতাসে, সেই গাছের পাতারাও এক নীরব ধ্বনি তোলে। সকাল কখনও হয় রৌদ্রতপ্ত আবার কখনও হয় হিমশীতল। তবে যাই হোক না কেন, এই সময়টা আমি সকল দুশ্চিন্তা এবং চাপ থেকে মুক্ত থাকি। বেলা বাড়ার সাথে সাথে এই চাপও আমার ওপর বোঝার মতো চাপতে থাকে।

দিল্লিতে, আমার বাড়ির বাগানে একটা অর্জুন গাছ আছে। গাছটার বয়স সম্পর্কে আমার ধারণা নেই। তবে দেখেই বোঝা যায়, গাছটা বেশ পুরনো। আমি যখন আমার বাগানে হাঁটি, কোনো এক অদ্ভুত কারণে আমি সেই গাছের দিকে যাই। এই গাছে অনেক প্রজাতির মথ আছে। মথ ছাড়াও হাজারো পাখি এই গাছে বসতি গড়েছে। বিশেষ করে তোতা পাখি।

এই গাছের সৌন্দর্য, গাম্ভীর্যতা এবং কঠোরতা আমাকে বাবার কথা মনে করিয়ে দেয়। আমি মাঝে মাঝে এই গাছের সাথে নীরব কথোপকথনও করে থাকি। আমি একটা কবিতা লিখেছি, এই গাছকে কল্পনা করে। গাছ যদি মানুষের মতো কথা বলতে পারত তাহলে বলত-

“বন্ধু কালাম,
প্রতিদিন সকালে তুমি হাঁটো, বোধহয় এক ঘন্টা।
চাঁদনি রাতেও দেখি তুমি হাঁটো
হাঁটার সাথে চিন্তাও করো
আমি জানি, তোমার চিন্তা বুঝতেও পারি
তবে একবার এল তো, আমি তোমাকে কি দিতে পারি?”

(কবিতার নাম “দ্য গ্রেট ট্রি ইন মাই হোম”)

.

আমার জীবন আমাকে যেদিকে নিয়ে যায়, আমি সেদিকেই ছুটে চলি। এই ছুটে চলার মাঝে প্রায়ই বাবার কথা মনে পড়ে। বাবার কথা মনে পড়লেই আমার মনের চিত্রপটে আমি একজন সাধারণ মানুষকে দেখতে পাই। সেই লোকটা বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও নিয়মমাফিক নারকেলের বাগানে হাঁটে। ঘন্টা পার হয়ে যায় তবে আমি তাকে দেখতেই থাকি। এর মাঝে নারকেল বাগানের কেয়ারটেকার জেগে ওঠে। বাবার সাথে সেই কেয়ারটেকার লোকটার দেখা হলে তারা একে অন্যকে আলিঙ্গন করে।

এরপর বাবা কোনো এক জায়গায় বসে পড়ে। তবে সেই লোকটা চট করে একটা গাছে উঠে যায়। সে কিছু নারকেল বেছে নারকেলের ডগায় তার ধারালো ছুরি চালায়। একের পর এক নারকেল পড়তে থাকে। লোকটাও ঝটপট গাছ থেকে নেমে আসে। এরপর সে নারকেলগুলো একসাথে বেঁধে ফেলে। এরপর দুজনে বসে আলাপ শুরু করে।

তারা নারকেল গাছের অবস্থা নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করে। এরপর আকাশের দিকে তাকিয়ে মাটি এবং বৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করে। অবশেষ বাবা উঠে দাঁড়ান এবং নারেকেলগুলো হাতে তুলে নেন। বাবা কেয়ারটেকারকে বিদায় জানিয়ে বাড়ির পথ ধরেন। বাবা কিছু নারকেল পাঠান প্রতিবেশীদের বাড়িতে। আর যা অবশিষ্ট থাকে সেগুলো মা তরকারিতে দেন।

আমি এখনও মায়ের হাতের সেই রান্নার স্বাদ ভুলতে পারি না। সেই সামান্য খাবার কি তৃপ্তি সহকারেই না খেতাম! মা আমার পাতার প্লেটে নারকেলের চাটনি তুলে দিতেন। সেই চাটনির স্বাদ এখনও আমার মুখে লেগে আছে। এই স্বাদ কেবলমাত্র খাবারের স্বাদ নয় এর সাথে মিশ্রিত আছে আমার সৎ এবং কঠোর পরিশ্রমী মা-বাবার নিষ্পাপ ভালোবাসা।

নৌকা

মাই জার্নি : স্বপ্নকে বাস্তবতা প্রদান – এ পি জে আবদুল কালাম নৌকা

নৌকা

আমি আগেই বলেছি রামেশ্বরাম মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন। রামেশ্বরামের এই দ্বীপেই আমি বেড়ে উঠি। আর যেহেতু সমুদ্রের খুব কাছাকাছি বড় হয়েছি, তাই সমুদ্র আমাদের জীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ ছিল। তাই আমার শৈশব স্মৃতির একটা বড় অংশ জুড়ে থাকবে, সমুদ্রের স্রোত, ঢেউ আছড়ে পড়ার ধ্বনি, পাম্বান ব্রিজের ওপর দিয়ে রেলগাড়ির ছুটে চলার শব্দ, পাখিদের পুরো শহর জুড়ে উড়ে বেড়ানো এবং সমুদ্রের সেই লবণ পানি যা বাতাসে এক অপূর্ব মহিমা ছড়িয়ে দিয়েছে।

সমুদ্রের সাথে কেবল আমাদের সম্পর্ক এখানেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সমুদ্র ছিল আমাদের জীবিকার উৎস। প্রায় প্রতিটি পরিবারই কোনো না কোনোভাবে সমুদ্রের ওপর নির্ভরশীল। কেউ জেলে হয়ে আবার কেউ নৌকার মালিক হয়ে। আমার বাবাও একটা ফেরি চালাতেন। সেই ফেরি রামেশ্বরাম থেকে ধনুশকরিত পর্যন্ত চলত এবং লোকজন আনা নেওয়ার কাজ করত। ধনুশকরি রামেশ্বরাম থেকে প্রায় ২২ কিলমিটার দূরে।

আমার এখনও মনে আছে বাবা কিভাবে এই ফেরি পারাপারের বুদ্ধি বের করলেন এবং কিভাবে নৌকা তৈরি করলেন। সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই রামেশ্বরাম ধর্মীয় দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গা। হিন্দু ধর্মালম্বীরা বিশ্বাস করেন যে, রাম সীতাকে উদ্ধারের সময় এই এলাকায় এসেছিলেন এবং লঙ্কায় যাওয়ার সেতু তৈরি করেছিলেন।

রামেশ্বরামের মন্দির মূলত শিবের উপাসনার জন্য তৈরি করা হয়। এই মন্দিরে যে শিবলিঙ্গ আছে তা সীতার তৈরি বলে ধারণা করা হয়। রামায়ণের কিছু কিছু সংস্করণে উল্লেখ আছে যে, রাম এবং সীতা লঙ্কা থেকে আযোধ্যায় যাত্রাকালে এখানে থেমেছিলেন এবং শিবের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। যারা আমাদের শহরে, মানে রামেশ্বরামে তীর্থযাত্রায় আসত তারা ধনুশকরিতে অবশ্যই যেত। কারণ ধনুশকরিতে ভ্রমণ তীর্থযাত্রার একটা বিশেষ অংশ। সাগর সঙ্গমে স্নান করা একটা পবিত্র প্রথা বলে বিবেচিত। ভারতসাগর এবং বঙ্গোপসাগরের মিলনস্থলকে সঙ্গম বলা হয়। ধনুশকরিতে যাওয়ার জন্য এখন রাস্তা নির্মিত হয়েছে এবং রামেশ্বরামের সাথে সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই পূণ্যারথিরা এখন ভ্যানে করেই ধনুশকরি যেতে পারে। তবে যখন আমি ছোট ছিলাম তখন ধনুশকরি যাওয়ার অন্যতম মাধ্যম ছিল এই ফেরি।

আমার বাবা তার স্বল্পআয়ের পাশাপাশি বাড়তি কিছু আয়ের জন্য এই ফেরি ব্যবসা শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। বাবা নৌকা তৈরির কাজ শুরু করলেন। এই নৌকা আমাদের ব্যবসায়ের জন্য তৈরি করা হবে। আমি বিস্ময় নিয়ে দেখতে থাকলাম কিভাবে কয়েক টুকরা কাঠ এবং ধাতু নৌকার আকৃতি পেল। আমার মনে হচ্ছিল এই নৌকা যেন জীবন পেয়েছে। এই নৌকা তৈরি স্বচক্ষে দেখার মাধ্যমেই ইঞ্জিনিয়ারিং জগতের সাথে আমার প্রথম পরিচয়। আমার বাবাকে সাহায্য করার জন্য তার এক ভাই এলেন। তিনি বাবার আপন ভাই নয়। বাবার চাচাত বা মামাত ভাই হবে। তার নাম আহমেদ জালালউদ্দীন।

বাবা যেখানে নৌকা তৈরি করছিলেন সেই জায়গায় যাওয়ার জন্য আমি প্রতিদিন অধীর অপেক্ষায় থাকতাম। প্রথমে লম্বা কাঠের টুকরোগুলোকে প্রয়োজনীয় মাপ অনুযায়ী কেটে নিয়ে শুকিয়ে নেওয়া হলো। এরপর সেগুলো আরও মসৃণ করে জোড়া দেওয়া হলো। কাঠের আগুনেই কাঠ সিজনিং করা হয়। সিজনিং হলো কাঠের ভেতরের রাসায়নিক পদার্থ শুকিয়ে ফেলার একটা প্রক্রিয়া, যাতে কাঠ পচে না যায়। আর এই সিজনিং করা কাঠ দিয়ে তৈরি হয় নৌকার হাল এবং বাল্কহেডস। ধীরে ধীরে নৌকার তল তৈরি হয়ে গেল। এরপর নৌকার দুই পাশের কাজ সম্পন্ন করা হলো। এরপর তৈরি করা হলো নৌকার হাল। আর এই পুরো প্রক্রিয়া আমি নিজ চোখে দেখেছি।

.

এর বহু বছর পরে, নিজের কাজ করতে গিয়ে, আমি রকেট এবং মিসাইল তৈরি করতে শিখি। রকেট এবং মিসাইলের ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পেছনে রয়েছে জটিল সব গাণিতিক সমীকরণ। এই সকল সমীকরণ অনেকের কাছেই এক ধরনের বিস্ময়। তবে যে নৌকা দিয়ে পূণ্যারথীদের ফেরি পার করানো হতো, তার তৈরির কৌশল এখনও আমাকে সমান বিস্মিত করে। কত সহজভাবেই না তৈরি হয়ে যায় একটি নৌকা। তবে এর পেছনের প্রক্রিয়া সত্যিই বিস্ময়কর। তবে এমন কেউ নেই যে বলবে না-এই সাধারণ নৌকা তখন আমাদের জীবনের কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং স্মরণীয় অংশ ছিল না।

তবে এই নৌকা তৈরি আরেকভাবে আমার ওপর প্রভাব ফেলে। আর এই প্রভাব দ্বারা আমি দারুণভাবে উপকৃত হই। এই নৌকা তৈরি করতে গিয়েই জালালউদ্দীনের সাথে আমার পরিচয় হয়। সে বয়সে আমার থেকে অনেক বড়। তারপরও আমাদের মাঝে ভালো বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। কোনো জিনিস শেখার জন্য আমার অদম্য আগ্রহ এবং না বুঝতে পারলে প্রশ্ন করার অভ্যাস, জালালউদ্দীন ধরতে পারেন। এবং তিনি সবসময় ধৈর্য্য সহকারে আমার কথা শুনতেন। আমার প্রশ্নের জবাব দিতেন এবং প্রয়োজনে দিকনির্দেশনাও দিতেন।

জালালউদ্দীন ইংরেজি লিখতে ও পড়তে পারতেন। তিনি আমার সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। তিনি বিজ্ঞানী, আবিষ্কার, সাহিত্য, চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে কথা বলতেন। রামেশ্বরামের রাস্তায় বা সমুদ্রের তীরে বা নৌকায় আমাদের মধ্যে এইসব বিষয় নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা চলত। তার সাথে কথাবার্তা বা আলোচনা করতে করতেই আমার মাঝে নতুন সব চিন্তা, এবং আকাঙক্ষার উদ্ভব ঘটে।

বাবার ফেরি ব্যবসা সফল হয়। আমার বাবা নৌকা চালানোর জন্য কয়েকজনকে কাজে রাখলেন। পূণ্যারথিরা আমাদের নৌকা ব্যবহার করেই ধনুশকরি যেত। অনেকবার আমি সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে ভিড়ের মাঝে নৌকায় উঠে পড়ি। নৌকা ছাড়লে আমি ভিড় থেকে সরে গিয়ে মাঝিদের পাশে বসে সমুদ্রযাত্রা উপভোগ করতাম নৌকা রামেশ্বরাম থেকে ধনুশকরি গিয়ে পৌছাত। আবার নতুন যাত্রী নিয়ে রামেশ্বরামে ফিরে আসত।

আমি রামের গল্পটা শুনেছি। রাম কিভাবে তার বানর সেনাদের নিয়ে লঙ্কায় যাওয়ার সেতু তৈরি করেছিলেন সেই গল্প। গল্পটা অনেকটা এরকম-রাম রাবনের রাজ্য লঙ্কা থেকে হরণকৃত সীতাকে উদ্ধার যাত্রায় রামেশ্বরামে থামে। সেখানে তার বানর সেনার সহযোগিতায় একটি সেতু নির্মাণ করে। সীতাকে উদ্ধার করে ফেরার পথে রাম এবং সীতা আবার রামেশ্বরামে থামে। থামার কারণ হলো-রাবনকে হত্যা করতে সক্ষম হওয়ার জন্য শিবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। তাই শিবের উপাসনা করার জন্য রাম হনুমানকে সুদূর উত্তর থেকে শিব লিঙ্গ নিয়ে আসার নির্দেশ প্রদান করে। তবে হনুমান দেরি করে ফেলে। আর হনুমানের দেরি দেখে সীতা নিজ হাতে শিবলিঙ্গ তৈরি করে এর স্থাপনা করে। শিবলিঙ্গ স্থাপনা শেষে তারা সেই লিঙ্গের পুজা করে শিবকে ধন্যবাদ জানায়।

এই গল্প এবং এরকম আরও অনেক গল্পই লোকমুখে শোনা যেত। পুরো ভারতজুড়ে লোকজন তীর্থযাত্রায় আসত। আর এই অঞ্চলে তীর্থযাত্রায় আসলে আমাদের ফেরি সার্ভিসই ব্যবহার করতে হতো। তাই এই সকল পূণ্যারথিদের মুখে একই গল্প ভিন্নভাবে শোনা যেত। এত লোকজনের মাঝে একটা ছোট বাচ্চা খুব সহজেই মিশে যেতে পারে। আর এই বিপুল সংখ্যক লোকের মাঝে কেউ না কেউ ঠিকই থাকত যে, আমার সাথে স্বেচ্ছায় কথা বলত। তারা খুব সরল মনেই নিজেদের জীবনের গল্প এবং তীর্থযাত্রায় আসার উদ্দেশ্য নিয়ে আমার সাথে কথা বলত।

এভাবেই বছর পার হয়ে গেল। আমি স্কুল, আমার শিক্ষকবৃন্দ এবং আহমেদ জালালউদ্দীনের কাছ থেকে অনেক শিক্ষা পেলাম। আর আমার এই শিক্ষার পেছনে সেই নৌকা এবং এর যাত্রীদের অবদানও অস্বীকার করতে পারব না। এভাবেই সমুদ্রের ঢেউ, সৈকতের সাদা বালি, হাসি-কান্না এবং গল্পের মাঝেই আমার দিন কেটে যাচ্ছিল।

একদিন হঠাৎ করেই, দেখা দিল বিপর্যয়। বঙ্গপসাগরে ক্রমাগত সাইক্লোন আঘাত হেনে যাচ্ছিল। সাইক্লোনের আঘাতের জন্য, নভেম্বর এবং মে মাস খুবই বিপজ্জনক। যে রাতে সাইক্লোন আঘাত হেনেছিল, সেই রাতের কথা আমি এখনও আবছাভাবে মনে করতে পারি। বেশ কয়েকদিন ধরেই ঝড়ো

বাতাস বইছিল। আর সেই রাতে বাতাস ভয়ংকর গর্জন শুরু করল। বাতাসের তীক্ষ্ম শব্দে আমাদের কান ঝালাপালা হওয়ার উপক্রম। বাতাসের ভয়াল তাণ্ডবে গাছগাছালি ভেঙে একাকার অবস্থা। সেই ভয়াল তাণ্ডব পথে যা পেয়েছে তাই চুরমার করে দিয়ে গেছে। খুব শীঘ্রই শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি। আমরা অনেক আগেই আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি। তখনকার দিনে আমাদের ওদিকে বিদ্যুৎ ছিল না। আর প্রচণ্ড বাতাসের কারণে প্রদীপেরও প্রায় নিভু নিভু অবস্থা। সেই মৃদু আলোতে অন্ধকার দূর হওয়ার বদলে আরও জেঁকে বসেছিল। এদিকে বাইরে তীব্র বাতাস বয়ে যাচ্ছে। আর বৃষ্টির ধারালো শব্দে তখন কান পাতা দায়। আমরা ঘরের ভিতর জড়ো হয়ে বসে, ভোরের অপেক্ষা করছিলাম। তবে আমার মনে তখন দুটো প্রশ্নই বারবার ঘুরে-ফিরে আসছিল। কেউ কি এই ভয়াবহ ঝড়ে সমুদ্রে আটকা পড়ল? আর এই ধরনের ভয়াবহ ঝড়ের কবলে মায়ের অনুপস্থিতি কেমন লাগবে?

সকাল নাগাদ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এলো। আমরা চোখে অবিশ্বাস নিয়ে ঝড়ের তাণ্ডবলীলার প্রমাণ দেখলাম। সবকিছু একাকার হয়ে গেছে। গাছপালা, বাড়িঘর, এবং ফসলাদি উপড়ে পরে আছে। যে জায়গায় আগের দিন পর্যন্ত রাস্তা ছিল, সেখানে এখন অথৈ পানি ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। সম্পূর্ণ রাস্তা পানিতে ডুবে গেছে। ঘন্টায় ১০০ মাইল বেগে যে বাতাস বইছিল তা বিভিন্ন ধ্বংসস্তূপ এনে ফেলেছে সৈকতে।

তবে আমরা যে খবরটা শুনে প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম তা হলো-আমাদের নৌকা পানিতে ভেসে গেছে। বর্তমানে আমার সেই দিনটির কথা মনে পড়লে আমি বুঝতে পারি যে, আমার বাবা ঠিকই বুঝতে

পেরেছিলেন যে এমনটা হবে। যদিও বাবা ছাড়া আমরা কেউই বুঝতে পারিনি যে, আমাদের নৌকা ভেসে যেতে পারে। আমরা কেবল ঝড় কেটে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম।

বাবা তার জীবনকালে অসংখ্য ঝড় এবং সাইক্লোন দেখেছেন। এই সাইক্লোনও তার মধ্যে একটা ছিল। তারপরও বাবা তখন আমাদের, বিশেষ করে ছোটদের শান্ত রাখার চেষ্টা করছিলেন এবং আমাদেরকে কোনো দুশ্চিন্তা করতে না দিয়েই ঘুমাতে পাঠান

তবে সকালের আলোতে, বাবার মুখ শুকনো লাগছিল। বাবার চোখের নিচে বসে যাওয়া দাগই বলে দিচ্ছিল যে, বাবা চিন্তায় আছেন। বাবাকে এমনভাবে দেখে আমি শক্ত হওয়ার চেষ্টা করলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম যে আমাদের ফেরি করার নৌকাটা আর ফেরত পাওয়া যাবে না। আমার এক ধরনের অনুভুতি হচ্ছিল। অনুভূতিটা এরকম যে-আমি নিজে হাতে কিছু তৈরি করলাম যা কোনো কথাবার্তা ছাড়াই ফেলে দেওয়া হলো। তবে আমার বাবার স্থিরতার কারণে আমরা সেই দুরাবস্থাও কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলাম।

কিছু সময়ের মধ্যেই অন্য একটা নৌকা তৈরি করা হলো। ব্যবসাও পুনরায় শুরু হলো। পূণ্যারথি এবং পর্যটকরাও আবার দল বেঁধে আসা শুরু করল। মন্দির এবং মসজিদে উপাসকদের ভিড়ে ভরে গেল। আর বাজার এলাকা আবার নারী-পুরুষের কোলাহলে মুখর হয়ে উঠল। আবার বেচাকেনা শুরু হলো।

এরপর বহুবার ঝড় বয়ে গেছে। তবে এরপর থেকে ঝড় আমার কাছে খুবই স্বাভাবিক একটা ঘটনায় পরিণত হয়েছে। আমি তখন ঝড়ের মধ্যেও শান্তিতে ঘুমাতে পারতাম। তারও অনেক পরে, ১৯৬৪ সালে বিরাট এক সাইক্লোন আঘাত হানল। তখন আর আমি রামেশ্বরামে নেই। সেই সাইক্লোনে ধনুশকরির ভূখণ্ডের বড় একটা অংশ সাগরে বিলীন হয়ে যায়। পাম্বান ব্রিজে একটা ট্রেন যাত্রারত ছিল। সেই ট্রেনও বহু পূণ্যারথি নিয়ে পানিতে ভেসে যায়।

.

১৯৬৪ সালের সেই সাইক্লোনে সেই অঞ্চলের বড়সড় একটা ভৌগোলিক পরিবর্তন ঘটে। তারপর থেকেই, ধনুশকরি একটি পরিত্যক্ত নগরীতে পরিণত হয়। সে তার পূর্বের রূপ আর ফিরে পায়নি।

আজ পর্যন্ত সেই শহরের স্থাপনাগুলো ১৯৬৪ এর সাইক্লোনের নিরব সাক্ষী হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। সেই সাইক্লোনেও বাবা তার ফেরি করার নৌকা হারায়। বাবাকে আবার নতুন করে ব্যবসা শুরু করতে হয়। আমি তখন অনেক দূরে ছিলাম। তাই বাবাকে খুব একটা সাহায্য করতে পারিনি। তবে আমি যখন Satellite Launch Vehicle (SLV) যা পৃথ্বী নামে পরিচিত এবং অগ্নি মিসাইলের কাজ করছিলাম তখন আমাদের কাউন্টডাউন এবং টেকঅফের কাজে বাঁধা আসল। কারণে আমাদের রকেট নিক্ষেপণ কেন্দ্র যা বঙ্গোপসাগরের ঠুম্বা এবং চান্দিপুরে অবস্থিত, সেখানে ভারী

বর্ষণ হচ্ছিল। তখন আমার মনে পড়ছিল বাবার কথা। ঝড়ের পরে বাবার চেহারা যেরকম থাকে, সেই চেহারা ভেসে বেরাচ্ছিল আমার কল্পনায়।

এটা এক ধরনের প্রদর্শন। আর প্রকৃতি হলো এই প্রদর্শনের প্রদর্শক। এই প্রদর্শন দ্বারা প্রকৃতি মূলত তার ক্ষমতা প্রদর্শন করে। প্রকৃতি দেখিয়ে দেয় যে, সে কিভাবে মুহূর্তের মধ্যে আমাদের সকল আশা, স্বপ্ন সবকিছু ভেঙে চুরমার করে দিতে পারে। আর প্রকৃতির এই ক্ষমতার মাঝে টিকে থাকতে পারার একমাত্র উপায় হলো সমস্যা থেকে দূরে পালিয়ে না গিয়ে এর মুখমুখি হওয়া এবং নিজের জীবনকে পুনর্গঠন করা।

আট বছরের এক ছেলের গল্প

মাই জার্নি : স্বপ্নকে বাস্তবতা প্রদান – এ পি জে আবদুল কালাম আট বছরের এক ছেলের গল্প

আট বছরের এক ছেলের গল্প

প্রতিদিন সকালে খবরের কাগজের এক বড় স্তূপ আমার কাছে পৌছে যায়। এই খবরের কাগজের অধিকাংশই ইংরেজি এবং তামিল। আমি যখন বিদেশ ভ্রমণে থাকি তখনও আমি ভারতের বিভিন্ন সংবাদ সম্পর্কে ওয়াকেবহাল থাকি। দেশের বাইরে থাকাকালীন অনলাইনে বিভিন্ন খবরের কলাম এবং সম্পাদকীয় পাতায় চোখ বুলিয়ে নেই। এই প্রযুক্তি এক কথায় অসাধারণ। মাত্র একটি ক্লিকেই অগণিত তথ্য পেয়ে যাবেন আপনি। আর এই তথ্যভাণ্ডার আমাকে বিস্মিত করে। যেহেতু আমি ইঞ্জিনিয়ারিং জগতের সাথে সম্পৃক্ত, প্রযুক্তির উন্নয়নে আমার বিস্ময় বোধ করা উচিত না। কিন্তু আমি যখন বর্তমান সময়ের সাথে ৭০ বছর আগের সময়কালটা তুলনা করি আমি বিস্মিত না হয়ে পারি না। বর্তমান সময়ে থেকে ৭০ বছর আগে একটি দক্ষিণ ভারতীয় শহরের জীবনের কথা চিন্তা করতে গিয়ে আমি চমকে উঠি।

আমার জন্ম ১৯৩১ সালে। যখন আমার বয়স আট, তখন শুরু হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ব্রিটেইন, হিটলারের নাজি জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ভারতের কংগ্রেস কোনো ধরনের যুদ্ধে জড়াতে চাইছিল না। কিন্তু ভারত তখন একটি ব্রিটিশ কলোনি। তাই যুদ্ধের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও ভারত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে রেকর্ড সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য মোতায়েন করা হয়।

তবে সাধারণ মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে যুদ্ধের তেমন কোনো প্রভাব পড়ল না। বিশেষ করে আমরা যারা দেশের দক্ষিণ প্রান্তে ছিলাম, তাদের জীবন সাধারণ নিয়মেই চলছিল। আমি আগেই বলেছি, ১৯৪০-এর দিকে রামেশ্বরামও আর পাঁচ দশটা সাধারণ ছোট শহরের মতোই ছিল। তবে এই শহর জীবন নিজ রূপ ফিরে পেত পুণ্যারথি এবং পর্যটকদের আগমনে। রামেশ্বরামের স্থানীয় লোকেরা পেশায় ছিল সাধারণ ব্যবসায়ী। অধিকাংশ লোকই ছোট ব্যবসায়ের সাথে জড়িত ছিল।

শহরের প্রাণকেন্দ্র ছিল একটি শিবমন্দির। তবে শহরে ভিন্ন ধর্মালম্বীদের উপাসনার জন্য একটি মসজিদ ও চার্চও ছিল। স্থানীয় লোকজনের পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই ভালো ছিল। সবাই মিলেমিশে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস করত। স্বাভাবিকভাবেই মানুষজনের মধ্যে মাঝেমাঝে ঝগড়া-বিবাদ হতো। এরকমটা সব জায়গায়ই হয়ে থাকে। কিন্তু কোনোদিন গুরুতর কোনো ঝামেলা হয়নি।

বহির্বিশ্বের সাথে আমাদের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল সংবাদপত্র। যে এজেন্সি রামেশ্বরামে সংবাদপত্র বিতরণ করত তার মালিকের নাম শামসউদ্দীন। শামসউদ্দীন সম্পর্কে আমার চাচাত ভাই। জালালউদ্দীনের পাশাপাশি শামসউদ্দীন আমার জীবনে অনেক বড় ভূমিকা রাখেন। শামসউদ্দীন লিখতে ও পড়তে পারতেন। তবে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। শামসউদ্দীন আমাকে ভীষণ পছন্দ করতেন। তিনি আমাকে নানাভাবে উৎসাহ দিতেন। এভাবেই তিনি আমার জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তারকারীদের একজন হয়ে ওঠেন। এই দুইজন ব্যক্তি আমার গভীর চিন্তাভাবনা এবং আবেগ- অনুভূতি খুব সহজেই বুঝে ফেলতেন। তাদেরকে আমার মুখ ফুটে কিছু বলা লাগত না। তারা নিজ থেকেই ধরে ফেলতেন। আমিও তাদেরকে দেখতাম ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে। আমার কাছে তারা ছিল, দুজন আগ্রহী মানুষ যারা নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনধারা এবং ব্যবসা থেকে বের হয়ে এই বিরাট পৃথিবী দেখার সুযোগ পাননি।

শামসউদ্দীনের সংবাদপত্র বিতরণ এজেন্সিই ছিল শহরের একমাত্র সংবাদপত্র বিতরণ সংস্থা। শহরে প্রায় হাজারের অধিক শিক্ষিত লোক ছিল। তাদের সকলের কাছেই সংবাদপত্র পৌছে দেয়া হতো। সংবাদপত্রে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন সংবাদ ছাপা হতো। তখন এই ধরনের সংবাদ বহুল আলোচিত সংবাদ।

এই সংবাদগুলো মানুষজন মন দিয়ে পড়ত এবং উৎসাহ নিয়ে আলোচনা করত। সংবাদপত্রে বিশ্বযুদ্ধের খবরও থাকত। হিটলার এবং তার নাৎসি সেনা সম্পর্কেও। এছাড়াও অন্যান্য সংবাদ তো থাকতই। যেমন, রাশি সংবাদ এবং বিভিন্ন পাথরের গুনাগুণ। এই সংবাদগুলোও সমান আগ্রহ নিয়ে আলোচিত হতো। সেই সময়কার সবচেয়ে জনপ্রিয় তামিল সংবাদপত্র ছিল “দিনামানি’।

এই সংবাদপত্রগুলো যে পদ্ধতিতে পাঠকদের হাতে পৌছাত, তাও বেশ স্বতন্ত্র। সংবাদপত্রের বান্ডিল সকালের ট্রেনে করে রামেশ্বরামের স্টেশনে পৌঁছাত এবং এজেন্সির লোক না যাওয়া পর্যন্ত স্টেশনেই রাখা হতো। এরপর স্টেশন থেকে সেই বান্ডিল সংগ্রহ করে পাঠকেদের কাছে পৌছে দেওয়া হতো। এই সংবাদপত্রগুলো পাঠকদের হাতে পৌছে দেয়াই ছিল শামসউদ্দীনের ব্যবসা। সে কোনো ঝামেলা ছাড়াই সহজভাবে তার কাজ করে আসছিল।

.

যাই হোক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পুরোদমে শুরু’ হওয়ার পর আমরা আর বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলাম না। আর এই অবিচ্ছন্নতা আমার জীবনে এবং সংবাদপত্র বিতরণ ব্যবসায় অদ্ভুতভাবে প্রভাব ফেলে। ব্রিটিশ সরকার অনেক ধরনের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের ওপর স্যাংশন জারি করল।

বর্তমানেও কোনো জরুরি অবস্থার প্রেক্ষিতে এ-ধরনের স্যাংশন বা অবরোধ জারি করা হয়। আমাদের সুবিশাল পরিবারেও তখন নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে অসুবিধার সম্মুখিন হলো। খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-আশাক, বাচ্চাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ কমে যাওয়ায় এগুলো সংগ্রহ করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। আমাদের পরিবারে আমরা ছিলাম পাঁচ ভাইবোন। আমার চাচাদেরও সবার পাঁচ সন্তান। আমাদের সবাইকে ভালো পোশাক-আশাক দিতে এবং দুবেলা পেট পুরে খাবার দেওয়ার জন্য আমার দাদিজান এবং মাকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করতে হতো। যুদ্ধের কারণে এভাবেই আমরা নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়েছিলাম।

অবস্থা বেশ খারাপ ছিল। এমন সময় শামসউদ্দীন নতুন এক প্রস্তাব নিয়ে আসল। তার প্রস্তাব শুনে আমি ভীষণ খুশি হয়েছিলাম। সরকার রামেশ্বরাম স্টেশনে ট্রেন থামানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এখন প্রশ্ন হলো-ট্রেন না থামলে সংবাদপত্র আসবে কোথা থেকে? কীভাবেই বা সেগুলো সংগ্রহ করে পাঠকদের কাছে পৌছানো হবে? এদিকে পাঠকরাও সংবাদপত্রের জন্য উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করবে। শামসউদ্দীন একটা উপায় বের করল। সংবাদপত্র আগে থেকেই বড় বান্ডিল করা থাকবে। আর যেই ট্রেন রামেশ্বরাম-ধনুশকরির রাস্তায় উঠবে, তখন চলন্ত ট্রেন থেকেই সেই বান্ডিল প্লাটফর্মে ছুঁড়ে ফেলা হবে। আর এখান থেকেই আমার ভূমিকা শুরু। আমাকে চলন্ত ট্রেন থেকে ছুঁড়ে ফেলা পেপার সংগ্রহ করে শহরের পাঠকদের কাছে সময়মতো পৌছে দিতে হবে। শামসউদ্দীনের কাছ থেকে এই কাজের প্রস্তাব পাওয়ার পর আমার আনন্দের সীমা রইল না!

আমার বয়স তখন মাত্র আট বছর। আর এই ছোট বয়সেই আমি আমার স্বল্প আয়ের দ্বারা কিছুটা হলেও পরিবারে সাহায্য করতে পারব। আমি অনেক দিন ধরেই একটা ব্যাপার লক্ষ করছিলাম। পরিবারের সবাইকে পেটপুরে খাওয়াতে গিয়ে আমার দাদিজান এবং মায়ের প্লেটে খাবারের পরিমাণ দিনকে দিন কমেই যাচ্ছিল। তারা নিজেরা না খেয়ে তাদের খাবার আমাদের সবাইকে ভাগ করে দিতেন। বিশেষ করে বাচ্চাদের সবসময়ই পরিমাণমতো খাবার দেয়া হতো। আমি পরিষ্কার মনে করতে পারি, আমাদের বাচ্চাদের কারোই এক বেলা না খেয়ে দিন কাটাতে হয়নি। এর পুরো অবদানই বাড়ির মহিলাদের। তারা নিজেদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি আমাদেরকে ভাগ করে দিচ্ছিলেন।

আমি খুশি মনেই শামসউদ্দীনের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম। আমার প্রতিদিনের রুটিন ঠিক রেখেই আমাকে এই নতুন কাজ করতে হয়েছিল। কাজের জন্য আবার পড়ালেখা এবং স্কুলের প্রতি অবহেলা করলে চলবে না। এগুলো আগের মতোই চালিয়ে যেতে হবে। এর সাথে সাথেই সংবাদপত্র আনা-নেয়ার কাজ করতে হবে।

আমার ভাইবোন এবং চাচাত ভাইবোনদের তুলনায় ছোটবেলা থেকেই আমি গণিতে অধিক দক্ষ ছিলাম। তাই আমার বাবা আমার জন্য আলাদা গণিতের শিক্ষকের ব্যবস্থা করলেন। আমি ছাড়া আমার শিক্ষকের আরও চারজন ছাত্র ছিল। আমার গণিত শিক্ষকের একটাই শর্ত ছিল। তা হলো—তার সকল ছাত্রকে গোসল করে ভোরবেলা, অর্থাৎ সূর্যোদয়ের আগেই তার বাড়িতে উপস্থিত থাকতে হব। তিনি এক বছর আমাদেরকে পড়াবেন। আর এই একবছর এই শর্ত পালন করে যেতে হবে। তাই আমার দিন শুরু হতো বাইরে অন্ধকার থাকতে থাকতে। আমার মা আমাকে ঘুম থেকে

তুলে দিতেন। আর আমাকে তুলে দেওয়ার জন্য আমার মাকে আমার আগে ঘুম থেকে উঠতে তো। তিনি আমার আগে ঘুম থেকে উঠে আমার গোসলের ব্যবস্থা করে রাখতেন। আমি উঠলে মা আমাকে গোসল করিয়ে দিতেন। গোসল শেষে আমাকে আমার গণিত শিক্ষকের কাছে পাঠাতেন। সেখানে এক ঘন্টার মতো

পড়ানো হতো। ভোর ৫টা নাগাদ আমি বাড়ি ফিরে আসতাম। এরমধ্যে বাবাও ঘুম থেকে উঠে যেতেন। আর আমি বাসায় ফিরে আসার পর বাবা আমাকে আরবি শেখার স্কুলে নিয়ে যেতেন। সেখানেই আমি কোরআন শরীফ পাঠ করা শিখি। কোরআন পাঠ শেষে, আমি তড়িঘড়ি করে রেল স্টেশনে ছুটতাম। সেখানে আমি ট্রেন আসার অপেক্ষায় থাকতাম। চোখ কান খোলা রেখে ট্রেনের অপেক্ষা করতে হতো। তবে আশ্চর্যজনক একটা বিষয় হলো, মাদ্রাজ-ধনুশকরি মেইল কখনও সময়মতো পৌছায়নি। এখনকার প্রায় সকল ট্রেনই সময়মতো পৌছে যায়। তবে তখনকার মাদ্রাজ-ধনুশকরি মেইল সবসময় দেরি করত।

অপেক্ষার এক পর্যায়ে দূরে ট্রেনের ইঞ্জিনের ধোয়া দেখতে পেতাম। আর ট্রেনের হর্ণের শব্দ গর্জনের মতো কানে বিধত। ট্রেন স্টেশনে না থেমেই সাবলীল গতিতে এগিয়ে যেত। আমি সংবাদপত্র বান্ডিল কোথায় ছুঁড়ে ফেলা হলো তা সহজেই দেখার জন্য একটা ভালো জায়গা খুঁজে বের করেছিলাম। ক্লকওয়ার্কের মতো করেই সংবাদপত্রের বান্ডিলগুলো প্লাটফর্মে ছুঁড়ে ফেলা হতো। তবে কোনো অবস্থাতেই ট্রেন থামানো হতো না। ট্রেন স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার পথে শামসউদ্দীনের লোক আমাকে হাত নেড়ে বিদায় জানাত। যখন ট্রেনের আর কোনো চিহ্ন থাকত না, এমনকি ট্রেনের হুইসেলও শোনা যেত না, তখন শুরু হতো আমার কাজ। আমি প্লটফর্ম থেকে সংবাদপত্রের বান্ডিলগুলো তুলে নিতাম। এরপর সেগুলোকে ব্যাচ অনুযায়ী ভাগ করতাম। অর্থাৎ, কোন বাড়িতে কোন পত্রিকা পৌছাবে, সেই অনুসারে ভাগ করতাম। ভাগ করা শেষ হলে শুরু হতো বিতরণের কাজ। পরবর্তী এক ঘন্টা ধরে আমি রামেশ্বরামের বাড়িতে বাড়িতে সংবাদপত্র বিলি করতে থাকতাম। সংবাদপত্র কাঙিক্ষত পাঠকদের কাছে পৌছে যেত।

শীঘ্রই আমি সংবাদপত্রের মাধ্যমে লোকজনকে মনে রাখা শুরু করি। অনেকেই আমার অপেক্ষায় থাকত যে, আমি কখন সংবাদপত্র নিয়ে যাব। সংবাদপত্র বিলি করার সময় প্রায় সকল গ্রাহকদের সাথেই দু একটা কথা হতো। অনেকেই আমাকে বলত, “তাড়াতাড়ি কর। না হলে তোমার স্কুলের দেরি হয়ে যাবে।” আমার মনে হয় আট বছরের এক ছেলের কাছ থেকে সংবাদপত্র নিতে সবার ভালোই লাগত। তারা আমাকে খুব সহজেই মেনে নিয়েছিল।

সকাল ৮টা নাগাদ আমার সংবাদপত্র বিলি করার কাজ শেষ হয়ে যেত। আমাদের শহর ছিল পূর্ব উপকূলে। তাই সূর্যও খুব তাড়াতাড়ি দেখা যেত। আর আমার কাজ শেষ হতে হতে সূর্য থাকত একদম মধ্য আকাশে। কাজ শেষ আমি সোজা বাড়ি চলে আসতাম। আমার মা নাস্তা নিয়ে আমার অপেক্ষায় থাকতেন। খুবই সাধারণ নাস্তা পরিবেশন করা হতো। তবে কাজ সেরে আসার পর আমার প্রচণ্ড ক্ষুধা পেত। তাই সেই সামান্য খাবারই আমার কাছে

অসামান্য মনে হতো। আমার মাও খেয়াল রাখতেন যেন আমি খাবারে শেষ টুকরোটাও খেয়ে নিয়েছি কি না। নাস্তা শেষে সোজা স্কুলে যেতাম।

তবে এখানেই আমার কাজের সমাপ্তি নয়। স্কুল শেষ হলে, সন্ধ্যায় আমি আবার সামসউদ্দীনের গ্রাহকদের কাছে বিল ওঠানোর জন্য চক্কর লাগাতাম। বিল নেয়া শেষ হলে, আমি তার সাথে দেখা করতাম। তিনি বিল বুঝে পেয়ে দিনের হিসেব সম্পন্ন করতেন।

দিনের হিসেব শেষে আমরা সমুদ্র তীরে কিছুটা সময় কাটাতাম। চারিদিকে মৃদু বাতাস বইতে থাকত। এক অসাধারণ পরিবেশ বিরাজ করত। কখনও আমার সাথে থাকত শামসউদ্দীন আবার কখনও জালালউদ্দীন। কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে আমরা দিনের পত্রিকা খুলে বসতাম। আমরা সবাই দিনামানি পত্রিকার কালো অক্ষরের ওপর ঝুঁকে পড়তাম। তাদের মধ্যে কেউ হয়ত কোনো একটা সংবাদ শব্দ করে পড়ত। এরপর আমাদের মধ্যে সেই সংবাদ নিয়ে আলোচনা এবং বিশ্লেষণ শুরু হয়ে যেত। গান্ধী, কংগ্রেস, হিটলার, ই.ভি. রামজিদের নিয়ে আলোচনায় সন্ধ্যার বাতাস মুখরিত হয়ে উঠত।

আমি আঙুল দিয়ে এই সকল বিশিষ্ট ব্যাক্তিদের ছাপা ছবি এবং তাদের নিয়ে প্রকাশিত সংবাদের কালো অক্ষরে হাত বুলিয়ে অবাক হয়ে ভাবতাম। ভাবতাম যে, এখান থেকে বের হয়ে বৃহৎ দুনিয়ায় এই সকল ব্যক্তিদের সাথে একসাথে থাকতে কেমন লাগবে!

আমি একা একা ভাবতাম, আমিও একদিন মাদ্রাজ, বোম্বে (বর্তমান মুম্বাই), কলকাতার মতো বড় শহরে পাড়ি জমাব। আরও ভাবতাম, যদি কখনও গান্ধী বা নেহেরুর সাথে আমার দেখা হয়ে যায় তাহলে আমি তাদের সাথে কি নিয়ে কথা বলব? তবে আমার বন্ধুরা আমাকে খেলতে ডাকলেই এ-বিষয় নিয়ে আর চিন্তা করা হতো না। খেলা শেষে বাড়ি ফিরে রাতের খাবার খেয়ে নিতাম। খাবার শেষে আবার বাড়ির কাজ নিয়ে বসতে হতো। বাড়ির কাজ করার পর আমার শরীরে আর বিন্দুমাত্র শক্তিও অবশিষ্ট থাকত না। রাত ৯টা নাগাদ আমি গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পরতাম। পরবর্তী দিন আবার আমাকে পড়াশুনা করতে হবে। কাজে যেতে হবে।

প্রায় এক বছর যাবত এই রুটিন অনুসারেই আমার জীবন এগিয়ে চলল। এই এক বছরে আমি শারীরিকভাবে আগের তুলনায় লম্বা হলাম। আমার ত্বকও আগের তুলনায় অধিক বাদামি হয়ে গেল। আর এই সময়ে আমি হিসেব-নিকাশ শিখে গেলাম। আমি সঠিকভাব হিসেব করে বলে দিতে পারতাম যে, পত্রিকার বান্ডিল হাতে, প্রতিটি বাড়িতে পত্রিকা পৌছে দিতে আমার ঠিক কত সময় লাগবে। আর আমি প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় সংবাদপত্র পৌছে দিতাম। কখনও সময়ের হেরফের হতো না বললেই চলে। আর সামসউদ্দীন কোনো গ্রাহকের কাছ থেকে কত টাকা পাবে তাও আমি মনে মনে হিসেব কষে বলে দিতে পারতাম। আবার কোনদিন কোন গ্রাহক টাকা দেয়নি তাও আমার মনে থাকত।

মূলত আমি এই এক বছরে শিখে ফেলেছি যে, একজন কর্মজীবী লোকের জীবন কেমন হয়। একজন কর্মজীবী লোকের জীবনে যা কিছুই ঘটুক না কেন, তাকে দিনের কাজ শেষ করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। বাড়ির কাজ, শিক্ষকের কাছে সময়মতো পড়তে যাওয়া, নামাজ সব ঠিকভাবেই চলছিল। এদিকে মাদ্রাজ-ধনুশকরি মেইলও বরাবরের মতো আমার অপেক্ষায় থাকত না। আমাকে তাই যথাসময়ে রেল স্টেশনে উপস্থিত থাকতে হতো এবং যথাসময়েই ছুঁড়ে ফেলা সংবাদপত্রের বান্ডিল সংগ্রহ করতে হত।

.

এভাবেই আমি প্রথম নিজ কাঁধে দায়িত্ব নিতে শিখি। এই দায়িত্ব আমি এক মুহূর্তের জন্যেও অবহেলা করিনি। পাশাপাশি আমি শামসউদ্দীনকে দেয়া কোনো প্রতিজ্ঞাও কখনও ভঙ্গ করিনি। যা কিছুই বলি না কেন, আমি আমার এই কাজের প্রতিটি মুহূর্ত দারুণ উপভোগ করেছি। সারাদিন কাজের পর রাতের প্রচণ্ড ক্লান্তিও কখনও আমাকে দমাতে পারেনি। মা প্রায়ই আমাকে এই অতিরিক্ত চাপ নিতে বারণ করতেন। আমার কষ্ট মা সহ্য করতে পারতেন না। তবে আমি মাথা নেড়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে হাসতাম। আমি জানতাম আমার উপার্জন সামান্য হলেও, তা পরিবারের কাজে আসছে। আর মাত্র আট বছর বয়সে নিজের কাঁধে দায়িত্ব নেয়ায় মা আমাকে নিয়ে গর্ব বোধ করত। তবে এ নিয়ে মা মুখে কিছু বলতেন না। আমিও কিছু না বলে, মুখে হাসি নিয়ে আমার দায়িত্ব পালন করছিলাম।

তিনটি মহৎ হৃদয় মিলে করল একটি সমস্যার সমাধান

মাই জার্নি : স্বপ্নকে বাস্তবতা প্রদান – এ পি জে আবদুল কালাম তিনটি মহৎ হৃদয় মিলে করল একটি সমস্যার সমাধান

তিনটি মহৎ হৃদয় মিলে করল একটি সমস্যার সমাধান

আমার শৈশব কাটে রামেশ্বরামে। আর রামেশ্বরাম ছোট একটি দ্বীপ। রামেশ্বরামের সর্বোচ্চ চূড়া হলো গান্দামাদান পর্বত। সেখানে দাঁড়িয়ে পুরো রামেশ্বরাম শহরটাকে দেখা যাবে। আপনি সহজেই দেখতে পাবেন পুরো শহর জুড়ে কিভাবে নারকেলের বাগান বেড়ে উঠেছে। দেখতে পাবেন দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র। আরও দেখতে পাবেন সুবিশাল রামনাথস্বোয়ামি মন্দিরের আকাশচুম্বি গপুরাম। রামেশ্বরাম তখন এক অসাধারণ শহর ছিল।

শহরের অধিকাংশ লোক মাছ ধরে বা নারকেল চাষের মাধ্যমে এবং মন্দিরের কারণে আসা পর্যটক এবং পুণ্যার্থিদের সেবার মাধ্যমে জীবিকা উপার্জন করত। অনেক ভারতীয়দের কাছে রামেশ্বরাম পবিত্রতম ধর্মীয় স্থান। আর তাই এই শহর বছরের প্রায় পুরোটা সময় জুড়েই পর্যটক এবং পুণ্যার্থিদের আগমনে ভরপুর থাকত।

শহরের ক্ষুদ্র জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দু জনগোষ্ঠী ছিল সংখ্যায় বেশি এবং স্বল্পসংখ্যক মুসলমান এবং খৃষ্টান লোকের জন্মভূমি ছিল এই অঞ্চল। প্রতিটি সম্প্রদায়ের মানুষের পারস্পারিক সম্পর্ক ছিল খুবই ভালো।

বাইরের দুনিয়ায় যে ধরনের বিভেদ এবং জাতিবিদ্বেষ দেখা যায় তার ছিটেফোঁটাও এখানে ছিল না। সকল সম্প্রদায়ের মানুষ মিলেমিশে শান্তি পূর্ণভাবে জীবনযাপন করত।

প্রতিদিনের পত্রিকা খুললেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং সংঘর্ষের সংবাদ দেখা যেত। প্রায় সমগ্র দেশ জুড়েই মানুষের মাঝে এই দাঙ্গা লেগে থাকত। তবে আমাদের রামেশ্বরামে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে শান্তি বিরাজমান ছিল। প্রজন্মের পড় প্রজন্ম ধরে এই শান্তির ধারা অব্যাহত আছে।

আমার বাবা আমাদেরকে প্রায়ই একটি গল্প বলতেন। গল্পটা আমাদের দাদার দাদাকে (পরদাদা) নিয়ে। বাবা এই গল্প বলতে ভালবাসতেন। আমাদের পরদাদা একবার একটি প্রতিমা উদ্ধার করেছিলেন। গল্পটা এরকম- এক উৎসবমুখর দিনে, মন্দিরের প্রতিমা কোনো একটা বিশেষ প্রথা পালনের জন্য এক পবিত্রস্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। স্থানটি মন্দিরের পাশাপাশি। মন্দিরের আশেপাশে অনেকগুলো কূয়া আছে। আর এই সব কূয়ার পাশ কাটিয়েই সেই প্রতিমা নিয়ে যেতে হবে। সেই ধর্মীয় যাত্রার কোনো এক সময়ে (এখন আর কারোই সঠিক মনে নেই, ঠিক কোন সময়ে) প্রতিমা একটা কূয়ায় পড়ে যায়। প্রতিমা পড়ে যাওয়া এক ভয়াবহ দুঃসংবাদ। সবাই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। প্রতিমা ফেলে দেওয়ায় ভগবান যে শীঘ্রই তাদের ওপর বিপর্যয় নিয়ে আসবে, তারা তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিল। কেউ ভয়ে সামান্যতম নাড়াচড়াটুকুও করছিল না। এমন সময় একজন লোক বুদ্ধির পরিচয় দিলেন। তিনি হলেন আমার পরদাদা। তিনি কূয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রতিমা উদ্ধার করলেন। মন্দিরের পুরোহিতরা এবং সাধারণ লোকজন তাকে অশেষ ধন্যবাদ জানালেন। তাদের আনন্দের আর সীমা রইল না। আর হ্যাঁ, আমার পরদাদা মুসলমান ছিলেন।

যারা কথায় কথায় জাত জাত করে এবং জাত বিশুদ্ধতা নিয়ে অতিমাত্রায় চিন্তিত তারা এই ঘটনার প্রচণ্ড নিন্দা জানালেন। কারণ একটা পবিত্রতম প্রতিমা অন্য ধর্মের কোনো একজন লোক ছুঁয়ে ফেলেছে, যার কি না এই প্রতিমা স্পর্শ পর্যন্ত করার অধিকার নেই। কিন্তু, রামেশ্বরামের কেউই এই ধরনের মনোভাব পোষণ করলেন না। উল্টো তারা আমার পরদাদাকে গভীর সম্মাননা প্রদান করলেন। তিনি বীরের মর্যাদা পেলেন।

মন্দির কর্তৃপক্ষ আবার ঘোষণা করল যে, এরপর থেকে প্রতি বছরই আমার পরদাদাকে মুদাল মারায়াদাই (MuqalMarayadi) দেওয়া হবে। এটা হিন্দু ধর্মালম্বিদের জন্যই বিরল এক সম্মানের

ব্যাপার। আর সেদিকে অন্য ধর্মাবলম্বি হলে তো কথাই নেই। মুদাল মারইয়াদা মানে হলো, প্রতি বছর আমার পরদাদাকে মন্দির থেকে সর্বপ্রথম সম্মাননা দেওয়া হবে। আমার পরদাদাকে বহু বছর ধরে এ-মর্যাদা দেওয়া হয়। বহু বছর ধরে এ-প্রথা চলতে থাকে এবং পালাক্রমে আমার বাবাও মন্দির থেকে মর্যাদা পেয়ে থাকেন।

পরবর্তী বছরগুলোতেও এই সাম্প্রদায়িক ঐক্যের ধারা অব্যাহত থাকে। আমি একটা অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি যে, আমার বাবা ফেরী পারাপারের ব্যবসা করতেন এবং সেই ফেরী মূলত পুণ্যার্থিদের আনা নেয়ার কাজ করত। আমার বাবা একজন মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও, পুণ্যার্থিদের বাবার ফেরীতে করে ধনুশকরি যাওয়া নিয়ে কোনো সংকোচ ছিল না। আর বাবাও পুণ্যার্থিদের পৌছে দেয়া নিয়ে কোনো ধরনের সাম্প্রদায়িক মনোভাব পোষণ করতেন না। এমনকি মন্দির কর্তৃপক্ষও প্রয়োজন হলে আমাদের ফেরী ব্যবহার করত।

আমার বাবা রামেশ্বরামের মসজিদের ইমামের দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান এবং একজন নিবেদিতপ্রাণ মুসলমান। আল্লাহ তাআলা এবং কোরআন শরীফের ওপর আমার বাবার অগাধ বিশ্বাস। তিনি তার সন্ত নিদের মাঝে একজন প্রকৃত মুসলমান হওয়ার সকল গুণাবলি সার্থকভাবে বপন করতে পেরেছেন। শুধুমাত্র সন্তান বললে ঠিক হবে না। তিনি তার পুরো পরিবারকেই এই শিক্ষা' দিয়েছিলেন। শহরের মানুষ তাকে একজন দার্শনিক এবং দিকনির্দেশক বলে বিবেচনা করত। যার কাছে সকল বিপদ আপদে সাহায্য পাওয়া যাবে। সে বিপদ জাগতিক হোক বা আধ্যাত্মিক হোক।

রামানাথস্বোয়ামী মন্দিরের পুরোহিত বাবার খুব কাছের বন্ধু ছিলেন। তার নাম পাকশি লক্ষ্মণ শাস্ত্রী। তিনি কেবলমাত্র একজন পুরোহিত ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন শিক্ষিত, জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি বৈদিক জ্ঞানে দীক্ষিত ছিলেন। তার চেহারা এবং অঙ্গভঙ্গি এখনও আমার পরিষ্কার মনে আছে। তিনি সবসময় সনাতন পুরোহিতদের বেশে থাকতেন। তিনি ধুতি এবং অঙ্গবস্ত্র পরিধান করতেন। তার মাথায় ব্রাহ্মণদের মতো টিকিও ছিল। কেননা মাথায় টিকি রাখা ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের জন্য অত্যাবশ্যক। আমার দেখা নিরিহ এবং দয়ালু ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

আমাদের ক্ষুদ্র জনজীবনে তৃতীয় আরেকজন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে বাবা এবং পুরোহিত শাস্ত্রীর মতো সমান গুরুত্বের অধিকারী। তিনি হলেন ফাদার বোডাল। তিনি ছিলেন শহরের চার্চের পাদ্রী। তিনিও বাবা এবং শাস্ত্রীর মতো জনকল্যাণ এবং রামেশ্বরামে শান্তি এবং একতা রক্ষার জন্য এক নিবেদিতপ্রাণ।

এই জ্ঞানী লোকদের স্মৃতি এখনও আমার মনে গেঁথে আছে এবং আজীবন থাকবে। আমি এদেরকে এখনও কল্পনায় দেখতে পাই। আমি আমার বাবাকে দেখতে পাই, ইমামের নির্ধারিত কুর্তা পরিহিত অবস্থায়। তার মাথায় থাকে টুপি। শাস্ত্রীকে দেখতে পাই তার ধুতি পরনে এবং ফাদারকে তার পাদ্রীর পোশাক পরিহিত অবস্থায়। এই তিন মহৎ ব্যাক্তি প্রতি শুক্রবার মিলিত হতেন। বিকাল চার

কি সাড়ে চারটার দিকে তারা একসাথে মিলিত হয়ে আলোচনা করতেন। ধর্ম এবং এলাকার অবস্থা নিয়ে আলোচনা।

মাঝেমধ্যে মানুষজন তাদের কাছে কোনো নির্দিষ্ট ঝামেলার মিমাংসার জন্য আসত। এই তিন মহৎ ব্যাক্তি খেয়াল রাখতেন যে, এলাকায় বিরাজমান শান্তির পথে যাতে কোনো ধরনের হুমকি বা প্রতিবন্ধকতা না এসে পড়ে এবং শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকে ও সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মাঝে একতা থাকে। তাই কোনো ধরনের ভুল বোঝাবুঝি বা গুজব ছড়ালে তারা সেগুলোর সমাধান করতেন। যাতে করে সেগুলো বিপজ্জনক কিছু ঘটাতে না পারে।

এই তিন মহত্মার কৃতিত্বে এলাকার মানুষের মাঝে সবসময় সুষ্ঠু যোগাযোগ বজায় থাকত। তারা শান্তিপূর্ণ যোগাযোগ বজায় রাখার জন্য তাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করে গেছেন। যাতে করে কারও মাঝে কোনো ভুল বোঝাবুঝি না ঘটে। তারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। যেমন-কিভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন দেশকে এক নতুন দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ব্রিটিশ সরকার জাতীয়তাবাদীদের ওপর কিরূপ আচরণ করছে। আর তাদের এই আচরণ কিভাবে আমাদের ওপর প্রভাব ফেলছে। এই সকল বিষয় নিয়ে তারা গভীর চিন্তা ভাবনা করতেন। তারা নীরব যোদ্ধার মতো তাদের আশেপাশের সমাজে শান্তি এবং একতা বজায় রাখতেন। আর সমাজের সকল স্তরের লোকজন নির্বিঘ্নে তাদের সাথে আলোচনা করতে পারত। তারা সবার কথাই মন দিয়ে শুনতেন। কাউকেই ফিরিয়ে দিতেন না বা কোনো ধরনের বৈষম্য করতেন না।

.

আমার শৈশবে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার মাধ্যমে এই মানুষগুলোকে আমি বুঝতে পারি। আমার বয়স তখন আট। আমি তখন তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি। আমার তিন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, রামনাথ শাস্ত্রী, অরবিন্দ এবং শীবপ্রকাশন। ওরা সবাই হিন্দু ধর্মের অনুসারী এবং জাতে ব্রাহ্মণ। বিশেষ করে রামনাথ হলো, পাকশি শাস্ত্রীর ছেলে। আমরা সবাই একই স্কুলে পড়তাম। তাই আমদের সারাটাদিনই কাটত একসাথে। ক্লাসরুমে এবং ক্লাসরুমের বাইরে উভয় সময়ই। আমাদের মধ্যে একজন অনুপস্থিত থাকলে আমরা মনমরা হয়ে থাকতাম। তখন আমাদের দিন ভালো কাটত না। এই বয়সের ছেলেদের জীবনে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে তা খুঁটিনাটিসহ একে অপরকে না জানালে আমাদের পেটের খাবার হজম হতো না। ক্লাসরুমেও আমরা চারজন আশেপাশেই বসতাম। রামনাথ এবং আমি বসতাম একই বেঞ্চে।

মূল ঘটনা শুরু করার আগে, আমার স্কুলের বর্ণনাটা দিয়ে নেই। এই স্কুলে নিয়ে কত স্মৃতিই না আছে! কত দুষ্টামিই না করেছি এখানে! আমার স্কুলের নাম ছিল রামেশ্বরাম পঞ্চায়েত প্রাইমারি স্কুল। আমি ১৯৩৬-১৯৪৪ সাল পর্যন্ত এই স্কুলে পড়াশুনা করি। স্কুল বিল্ডিং সমুদ্র তীরের কাছাকাছি ছিল। স্কুল বিল্ডিং শহরের ছিমছাম বিল্ডিংগুলোর একটা ছিল না। বিল্ডিংয়ের কিছু অংশ ইটের তৈরি। কিন্তু বিল্ডিংয়ের ছাদ খড় দিয়ে তৈরি। এই স্কুলই ছিল রামেশ্বরামের একমাত্র স্কুল। তাই শহরের সব ছেলে-মেয়েই লাইন বেধে এই স্কুলেই আসত। আমাদের মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল প্রায়

৪০০। হ্যাঁ, আমাদের স্কুলের বিশেষ কিছু নেই, এমনকি সুযোগ-সুবিধাও খুবই সামান্য। তবে এই স্কুল আমার ভীষণ পছন্দের একটা জায়গা ছিল।

ছাত্র-ছাত্রীরা সকল শিক্ষকদেরই অসম্ভব ভালোবাসত। বিশেষ করে, যারা ইতিহাস, ভূগোল এবং বিজ্ঞান পড়াতেন তাদেরকে। এখন অনেকেই হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, 'কেন?' কারণ, তারা শিক্ষকতা ভালোবাসতেন এবং খেয়াল রাখতেন যে, তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নতি হচ্ছে কি না। প্রতিটি ক্লাসে ৫৫ জনের মতো ছাত্র থাকত। সেই ৫৫ জনের প্রতি সমান মনোযোগ দেওয়া কোনো সহজ ব্যাপার নয়। আমাদের শিক্ষকরা চাইতেন আমি যেন ভালো নম্বরের পাশাপাশি, যে বিষয় নিয়ে পড়ছি, সেই বিষয়ে আগ্রহ খুঁজে পাই। আমরা আমাদের শিক্ষকদের মাঝে এক ধরনের পবিত্রতা অনুভব করতে পারতাম।

যদি কোনোদিন একজন মাত্র ছাত্রও অনুপস্থিত থাকত, তাহলেও শিক্ষকরা সেই ছাত্রের বাড়ি যেতেন। তাদের বাবা-মায়ের সাথে কথা বলতেন এবং তাদের অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাইতেন। আমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেত, শিক্ষকরা তার বাড়ি গিয়ে তার বাবা-মাকে সেই খবর সবার আগে দিতেন। আমার স্কুল ছিল আমার ভীষণ পছন্দের একটি স্থান। আমরা যারা নিজেদের শিক্ষাজীবন এই স্কুলে শুরু করেছি, তারা সবাই অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এই স্কুলেই পড়ালেখা করেছি। আমি এমন কোনো ছাত্রের কথা মনে করতে পারছি না, যাদেরকে ফেল করে একই শ্রেণিতে দ্বিতীয়বার থাকতে হয়েছিল।

বর্তমানে আমি যখন কোনো স্কুলে যাই, তা ছোটই হোক কিংবা বড়ই হোক, সেখানে আমি কিছু কথা বলি। আমি বলি যে, ভালো স্কুল বিল্ডিং বা সুযোগ-সুবিধা কিংবা ব্যাপক প্রচার দ্বারা স্কুলের মান নির্ধারণ করা যায় না। স্কুলের মান তখনই ভালো হবে, যখন শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ভালোবেসে কোনো কিছু শেখাবেন।

এবার মূল গল্পে ফিরে আসি। তখনকার দিনে স্কুলে, বিশেষ করে ছোট স্কুলগুলোতে কোনো ইউনিফর্ম থাকত না। আমার স্কুলও এর ব্যতিক্রম ছিল না। আমরা যে কোনো কিছু পরেই স্কুলে যেতে পারতাম। এমনকি ধর্মীয় পোশাক পরে গেলেও কোনো সমস্যা হতো না। আমার বন্ধু রামানাথও ওর বাবার মতো মাথায় টিকলি রেখেছিল (পরবর্তীতে ও প্রাপ্তবয়স্ক হলে, ওর বাবার মতোই মন্দিরের পুরোহিতের কাজ করে)। আমি স্কুলে যেতাম মাথায় টুপি পরে। শহরের সকল মুসলমান ছেলেরাই টুপি পরে স্কুলে যেত। আমাদের মধ্যে কারোই এসব নিয়ে কোনো মাথা-ব্যথা ছিল না। এমনকি আমরা খেয়াল পর্যন্ত করতাম না, কে কি পরছে বা না পরেছে।

আমরা যখন তৃতীয় শ্রেণিতে তখন আমাদের জীবনে এক নতুন ঘটনা ঘটল। আমাদের স্কুলে এক নতুন শিক্ষক এলেন। যেকোনো ছোট শহরেই নতুন কারো আগমন উত্তেজনার ব্যাপার। এবং এ নিয়ে সবার মাঝে আলোচনা হয়। আমরা ছাত্র-ছাত্রীরা উত্তেজনায় ফেটে পড়ছিলাম যে-আমাদের নতুন শিক্ষক কেমন হবে। তিনি কি অনেক কঠোর হবেন নাকি নরম স্বভাবের হবেন? আমরা তার ক্লাসের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহ নিয়ে বসে রইলাম।

প্রথমদিন আমাদের শিক্ষক ক্লাসে এলেন। আমরা সবাই তখন উত্তেজনার তুঙ্গে। আমাদের নতুন শিক্ষক একজন হিন্দু ধর্মালম্বী ছিলেন। জাতে ব্রাহ্মণ। তিনি ক্লাস রুমে প্রবেশ করেই আমাদের সকলের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। মূলত তিনি আমাদের পোশাকের বৈচিত্র্যতা দেখছিলেন। আমাদের নতুন শিক্ষক দ্রুত ব্যস্ত হয়ে পরলেন। তিনি ক্লাসের সামনে এসে দাঁড়ালেন। প্রথমেই তার চোখ পড়ল রামনাথ এবং আমার ওপর। আমি আর রামনাথ ছিলাম ক্লাসের সেরা ছাত্র। আমরা সবসময়ই নতুন কিছু শেখার জন্য সদা-আগ্রহি থাকতাম। আমরা প্রথম বেঞ্চে বসতাম। আমাদের শিক্ষকের দৃষ্টি আমার টুপি এবং রামনাথের টিকলির দিকে নিবদ্ধ হলো। তার চেহারায় এক ধরনের বিরক্তি এবং অবিশ্বাসের ছায়া পড়ল। তিনি কোনো কারণ ছাড়াই আমাদের দুজনের নাম জানতে চাইলেন। আমি যখন আমার নাম তাকে জানালাম, তিনি আমাকে দ্রুত আমার বইপত্র গুছিয়ে পেছনের সারিতে বসতে বললেন। তিনি কেন এমন করলেন, তার কারণ শুধুমাত্র তিনি নিজেই জানেন। এখন যখন আমার এই ঘটনার কথা মনে হয়, আমি পরিষ্কার দেখতে পাই, আমাদের নতুন শিক্ষক ক্লাসে ঢুকে একটা বিষয় দেখতে পাননি। তা হলো, আগ্রহি বাচ্চাদের মুখে হাসি। যা না দেখেও তিনি কেড়ে নিতে সফল হয়েছিলেন।

এই ঘটনায় আমি অনেক কষ্ট পেলাম। আমার নিজেকে অপমানিত মনে হলো। আমি ভাবছিলাম, তিনি কেন এমন করলেন। রামনাথের চোখ দিয়ে পানি পড়ছিল। আমি এখনও সেই দৃশ্য পরিষ্কার মনে করতে পারি। আমি আমার বইপত্র গুছিয়ে পেছনের সারিতে যাচ্ছি আর রামনাথের বড় বড় চোখ বেয়ে পানি বেয়ে পড়ছে। তবে আমরা কেউই এই ধরনের আচরণ মেনে নিলাম না। আমি আমার বাবাকে এই ঘটনা জানালাম। রামনাথও তার বাবাকে জানাল। আমাদের দুজনের বাবাই আমাদের কথা শুনে বিস্মিত হলেন। তারা আমাদের এই ছোট সমাজটাকে যেভাবে গড়ে তুলেছেন, এই আচরণ তার সম্পূর্ণ বিপরীত। যে ব্যাক্তির দায়িত্ব আমাদেরকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করা এবং আমাদের মানসিকতার নব-দ্বার উন্মোচন করা, তিনি ঠিক তার উল্টোটা করছেন। তারা দ্রুত নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নিলেন। এবং ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন।

.

পরবরতী শুক্রবার, বরাবরের মতোই তারা সন্ধ্যায় মিলিত হলেন। ফাদার ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমাদের নতুন শিক্ষককেও সেখানে ডাকা হল। তিনিও এসে উপস্থিত হলেন। সন্ধ্যার আধারে আমার বাবা এবং পণ্ডিত শাস্ত্রী তাকে বোঝালেন—গোটা ভারতবর্ষে যে ধর্মীয় বিভাজন এবং গোড়ামির কারণে দাঙ্গা চলে তা এখানে চলবে না। তারা তাদের সন্তানদেরকে কোনো বিভাজন বা পরধর্মের প্রতি তিক্ত অনুভূতি পোষণের শিক্ষা পেতে দেবেন না। আর এই বিভাজনের শিক্ষা যদি কেউ দিতে চায়, তবে তারা তার আচরণও সহ্য করবেন না। তারা চান না যে সমাজের সর্বকনিষ্ঠ সদস্যদের মাঝে কোনো বিভাজন বা এ-জাতীয় অনুভতি তৈরি হোক।

আর এই সব কিছু তাকে অত্যন্ত ভদ্রভাবে জানানো হয়েছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি কি নিজেকে এমন এক ব্যক্তি মনে করেন কি না, যার হাতে দেশের ভবিষ্যৎ গড়ার দায়িত্ব তুলে দেয়া হয়েছে? আমাদের শিক্ষক সেখানে নীরবে দাঁড়িয়ে চিন্তা করছিলেন। অবশেষে তিনি মুখ খুললেন।

তিনি নিজের দোষ স্বীকার করলেন। তিনি বললেন যে, তিনিই ছেলে দুটোকে আলাদা বসতে বলেছেন। তিনি এর পরিণতি না ভেবেই এই কাজ করেছেন। তিনি এতদিন ধরে তার চারপাশের সমাজকে এভাবেই দেখে এসেছেন। আর তিনিও তাই সেই নিয়মের অন্ধ অনুকরণ করেছেন। কেউ তাকে কোনোদিন ঐক্যের শিক্ষা দেয়নি। তিনি বরাবরই বিভাজন দেখে এসেছেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, তিনি যে কাজ করেছেন, পরবর্তী দিন তা শুধরে নেবেন। এবং তিনি তাই করেছিলেন।

এভাবেই আমার প্রথম এবং সরাসরি অভিজ্ঞতা হলো-এই তিনটি মহৎ- হৃদয় নিয়ে। তিন জন ধর্ম-নেতা খোলাখুলিভাবে কিন্তু দৃঢ়তার সাথে একটি সমস্যার সমাধান করলেন। তারা এই সমস্যা ছড়িয়ে পড়ার আগেই, তা দূর করলেন। এটি উত্তম ব্যবস্থপনার একটি অংশ। আমি পরবর্তীতে এর শিক্ষা পাই।

এই সময় আমার মনে আরেকটি নতুন চিন্তা উঁকি দেয়। তা হলো—আমাদের ভেতরের বিশ্বাস এবং লালিত রীতিনীতির দ্বারাই আমাদের আচরণ নির্ধারিত হয়। বহিরাগত শক্তি, প্ররোচণা এবং পরামর্শ, সব সময়ই আমাদের পাশে থাকবে। তবে আমাদের মধ্যে যারা ভালো এবং ন্যায়ের ওপর নিজেদের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, তারাই আমাদের মাঝে শান্তি বয়ে আনতে পারবে। আমাদের দেশে এমন নাগরিকের প্রয়োজন, যে নিজের অন্তরের সত্যটাকে বিশ্বাস করবে। যাদেরকে কোনো ধরনের প্ররোচণা দ্বারা বিভ্রান্ত করা যাবে না।

.

আর আমার ধর্ম নিয়ে যদি আমাকে কিছু বলতে হয়, তাহলে আমি কিছু কথা খোলাখুলিভাবে বলতে চাই। রামেশ্বরাম থেকে আমি নিজের ভাগ্যকে অনুসরণ করে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ভূবনে প্রবেশ করি। আমি সবসময়ই বিজ্ঞানের বিশ্বাসী ছিলাম। তবে বিজ্ঞানে বিশ্বাসী বলে, আমি কখনই আধ্যাত্মিকতা ভুলে যাইনি। তা আমার মাঝেই রয়ে গেছে।

আর সৃষ্টিকর্তা নিয়ে ভিন্ন মতবাদ থাকার বিষয়টাও আমি বুঝতে পারি। আমি বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে অনেক জ্ঞান লাভ করেছি। আমি কুরআন থেকে শুরু করে গীতা, বাইবেলও পড়েছি। আর এই তিন ধর্মাবলম্বীর মানুষ নিয়েই মূলত আমাদের দেশ। এক ধরনের বৈচিত্রময় ঐতিহ্য তৈরি হয়েছে, যা আমাদের দেশের স্বতন্ত্রতা প্রকাশ করে। যদি আমাকে কেউ প্রশ্ন করে, এ- দেশে একজন মুসলমান নাগরিক হিসেবে আমি কেমন বোধ করি, তাহলে আমি আমার বাবা; পণ্ডিত শাস্ত্রী, ফাদার বোডাল এবং আরও অনেকের কথা উল্লেখ করব। এঁদের সান্নিধ্যেই আমি বেড়ে উঠেছি। এঁরা সবাই আমাদের দেশের ধর্মীয় চেতনা এবং নৈতিকতাবোধের আদর্শ মাপকাঠি। তাঁরা সবাই তাদের নিজেদের মতো করে এ-দেশের প্রত্যেক ধর্মের মানুষের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে গেছেন, যেন মানুষে মানুষে কোনো বিবাদ-বিভাজন না থাকে। হ্যাঁ, আমরা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সমস্যায় জড়িয়ে পড়ছি। তবে এই দেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম যদি আমার পরদাদা এবং একজন ইমাম, পাদ্রি ও ফাদারের ঐক্যের গল্প মনে রাখে, তবে জাতি হিসেবে আমরা অটুট থাকব। একটি সেক্যুলার গণতন্ত্রের মতো আমাদের উন্নয়ন ঘটবে।

আমার মমতাময়ী মা এবং স্নেহশীল বোন

মাই জার্নি : স্বপ্নকে বাস্তবতা প্রদান – এ পি জে আবদুল কালাম আমার মমতাময়ী মা এবং স্নেহশীল বোন

আমার মমতাময়ী মা এবং স্নেহশীল বোন

আজ থেকে বহুদিন আগে, (বেশ কয়েক বছর) আমি একটি কবিতা লিখেছিলাম। কবিতার নাম 'আমার মা'। কবিতাটি হলো-

মা,

এই সুবিশাল সমুদ্রের প্রতিটি স্রোত, এই মৃত্তিকার সোনালি বালুকণা, তীর্থযাত্রার অভিযাত্রীদের দৃঢ় সংকল্প, রামেশ্বরম মসজিদের সেই পবিত্র রাস্তা, এই সবকিছুই যেন তোমার মাঝে মিশে এক হয়েছে। আমার জীবনে তুমি এক স্বর্গীয় আশির্বাদ। জীবনযুদ্ধের সেই কঠিন দিনগুলোর কথা আমার এখনও মনে পড়ে।

মনে পড়ে, আকাশে সূর্যের প্রথম কিরণ উকি দিলেই, কয়েক মাইল পথ পাড়ি দিয়ে মন্দিরের কাছে আমার ফেরেশতার মতো শিক্ষকের কাছে পড়তে যাওয়ার কথা। এরপর আবার কয়েক মাইল পথ পাড়ি দিয়ে আরবি শিখতে যাওয়ার কথা।

মনে পড়ে, স্টেশন রোডের সেই পাহাড়ি রাস্তা পাড়ি দিয়ে সংবাদপত্র সংগ্রহ করে তা সবার মাঝে বিলিয়ে দেওয়ার কথা। সূর্যোদয়ের কিছু সময় পরেই আবার স্কুল, এরপর সারাটা সন্ধ্যার কর্মব্যস্ততার পড়ে রাতে আবার পড়াশুনা করার পালা।

সেই দুর্ভাগা কিশোরের কষ্টগুলোকে, মা তুমি পরিণত করেছ শক্তিতে, সৃষ্টিকর্তার কাছে দিনে পাঁচবার মাথা নত করে। সর্বশক্তিমানের করুণা চেয়ে। মাগো, তোমার ভক্তি, তোমার সন্তানের সবচেয়ে বড় শক্তি। তুমি সর্বদা সকলকে কেবল দিয়েই গেছ। সৃষ্টিকর্তার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে বিলিয়ে দিয়েছ নিজেকে।

তখন আমার বয়স মাত্র দশ। তোমার কোলে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলাম আমি। তোমার কোলে আমাকে ঘুমাতে দেখে ভাইবোনদের হিংসা হচ্ছিল তখন। সেদিন ছিল জোৎস্না রাত, আর আমার সমগ্র দুনিয়া ছিল কেবল তোমাকে নিয়ে মা। শুধুমাত্র তোমাকে নিয়ে।

মাঝরাতে যখন আমি চোখে পানি নিয়ে জেগে উঠেছিলাম, তখন তুমি ঠিকই তোমার সন্তানের কষ্ট বুঝতে পেরেছিলে। তোমার হাতের উষ্ণ ছোঁয়ায় আমার সব কষ্ট দূর হয়ে যেত।

তোমার ভালোবাসা, তোমার স্নেহ, তোমার বিশ্বাস আমাকে শক্তি দিয়েছে। আমি নির্ভীকচিত্তে জগতের সকল সংগ্রামের মুখোমুখি হতে পেরেছি। বিচারের দিনে আবার তোমার সাথে দেখা হবে মা।

আমার শ্রদ্ধেয় মায়ের স্মরণে

.

শৈশব থেকে বেড়ে ওঠা পর্যন্ত আমার যত স্মৃতি আছে তার প্রায় সবগুলোই রামেশ্বরামকে নিয়ে। রামেশ্বরামের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে। আর এই বেড়ে ওঠার সময়টাতে আমার জগতের মধ্যমণি ছিল দুজন-তারা হলেন আমার মা এবং বাবা।

আমি বেড়ে উঠি একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে। আমার বাবা ছিলেন রামেশ্বরামের মসজিদের ইমাম। এছাড়া বাড়তি আয়ের জন্য বাবা কিছু ব্যবসায়ের সাথেও জড়িত ছিলেন। ছোটখাট ব্যবসা। আমার মায়ের নাম আশিয়ানা। আমার মা বংশগত দিক দিয়ে খানদানি। আমার মা যে পরিবার থেকে এসেছেন, সেই পরিবার ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক 'বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিল। অনেক আগেই তারা এ-উপাধি পায়। আমার মা একজন অত্যন্ত বিনয়ী এবং ধার্মিক মহিলা। মা ও বাবার মতো একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান। মা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজই সময়মতো আদায় করতেন। আমার মনে পড়ে না যে, মায়ের কখনও এক ওয়াক্তের নামাজও কাযা হয়েছিল। নামাজের সময় মায়ের মধ্যে এক ধরনের নিষ্ঠা এবং শান্তিপূর্ণতা বিরাজ করত। আমাদের বিশাল পরিবারের দেখাশুনা মা একাই করতেন। আর পরিবারের দেখাশোনা করতে গিয়েই মা নিজের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে দিতেন। আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, আমাদের ছিল একান্নবর্তী পরিবার। আমাদের পরিবার গঠিত ছিল আমি, আমার ভাইবোন, আমাদের কিছু নিকট আত্মীয়, আমার দাদা-দাদি, চাচা-চাচি এবং তাদের সন্তানদের নিয়ে। আমরা সবাই একই বাড়িতে থাকতাম। এই বিশাল পরিবারের সবার চাহিদা মেটানো কখনই সম্ভব ছিল না। সামান্য হলেও, অভাব লেগেই থাকত। আমাদের সবার জন্য কোনো কিছুই প্রচুর পরিমাণে ছিল না। আমার বাবার নৌকা তৈরির ব্যবসা, ফেরী ব্যবসা এবং নারকেলের বাগান ছিল। তার আয় বেশ ভালোই ছিল। তবে তার আয়ের সম্পূর্ণ অংশই খরচ হতো আমাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় মেটাতে। আমাদের পক্ষে বিলাসিতা করার কোনো সুযোগ ছিল না।

এই প্রেক্ষিতে মা ছিলেন বাবার জন্য যথোপযুক্ত সঙ্গিনী। আমার মা মিতব্যয়ীতার মর্ম বুঝতেন এবং তিনি নিজেও মিতব্যয়ী ছিলেন। আর মিতব্যয়ীতার মাধ্যমে সংসার চালাতে গিয়ে তিনি এক মুহূর্তের জন্যও বিরক্ত হতেন না বা রাগও করতেন না। এমন কি আমাদের জীবনযাপন নিয়ে তার সামান্যতম কোনো অভিযোগও ছিল না।

প্রায় প্রতিদিনই পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি অতিথিরাও আমাদের সাথে খাবার খেতেন। আমাদের বাড়িতে অতিথিদের ভীষণ যত্ন করা হতো। আর কোনো অতিথি কোনো স্বল্প সময়ের জন্য বা কোনো কাজে এলেও আমরা তাদেরকে না খাইয়ে যেতে দিতাম না। এতে পরিবারের সদস্যরাও সন্তুষ্ট হতো এবং অতিথিরাও। এখন যে কথা মনে পড়লে আমি বুঝতে পারি, মাকে প্রতিদিন দ্বিগুণ রান্না করতে হতো। কারণ অতিথির সংখ্যাও পরিবারের সদস্য সংখ্যার সমান থাকত। তবে মা খুব স্বাভাবিকভঅবেই রান্নার কাজ করে যেতেন। তিনি কখনও এটিকে বাড়তি চাপ বা উটকো ঝামেলা হিসেবে বিবেচনা করতেন না। এক সময় গোটা ভারতবর্ষই আতিথিয়তার জন্য বিখ্যাত ছিল।

আমার শৈশব কাটে আনন্দের মধ্য দিয়ে। আমার শৈশব ছিল নিরাপদ। আমার শৈশবের স্মৃতির একটি বিশেষ অংশ জুড়ে আছে মায়ের সাথে খেতে বসা। আমরা রান্নাঘরের মেঝেতে খাবার খেতাম। খাবার খেতাম কলাপাতায়। আমাদের কমন খাবারের আইটেম ছিল ভাত, আর বাড়িতে তৈরি চাটনি এবং নারকেলের চাটনি। আমার মায়ের রান্নার হাত ছিল সাধারণ তবে অতুলনীয়। মায়ের হাতের তৈরি খাবারের যে স্বাদ লেগে আছে তা আমি আর কোথাও পাইনি। মায়ের তৈরি এই খাবারে টক এবং মসলার মধ্যেকার ভারসাম্য ছিল একদম যথাযথ। খাবারের কথা বলাতে আরেকটা গল্প মনে পড়ে গেল। এই গল্পও খাবারের সাথে সম্পৃক্ত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার কথা। আমরা রেশনের মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্য কিনতাম। তবে যুদ্ধের কারণে খাবারের সরবরাহ কমে যায়। তাই সবসময় ঘাটতি লেগে থাকত। কখনই পরিমাণে পর্যাপ্ত কিছু কেনা যেত না। আমার মা এবং দাপিজান সবকিছু ঠিকভাবে চালিয়ে নেয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। একই সাথে খাবার যতটা সম্ভব সংরক্ষণ করা যায় তারা সেই চেষ্টাও করতেন। তারা এই বিষয়েও খেয়াল রাখতেন যাতে খাবারের অপচয় না হয়। তাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা যেন পর্যাপ্ত খেতে পায় তারা সেজন্য নিজেদের ভাগের খাবারও কোনো অভিযোগ ছাড়াই সন্তানদের মাঝে ভাগ করে দিতেন। একদিন মা ভাতের বদলে চাপাতি বানালেন। চাপাতি এক ধরনের শক্ত রুটি। সেদিন খেতে বসে আমি তৃপ্তির সাথে একের পর এক চাপাতি খেতে থাকলাম। মাও চাপাতি দিয়ে যাচ্ছিলেন। আর আমিও খেয়ে যাচ্ছিলাম। কী আর করা! অনেক ক্ষুধা পেয়েছিল যে। আমার খাওয়া যখন শেষ হলো, আমি আমার কলাপাতার প্লেট হাতে উঠে গেলাম। প্লেট পরিষ্কার করলাম। রাতে আমার ভাই যখন যখন বাড়িতে এলেন, তিনি আমার সাথে কথা বলার জন্য ঘরের এক পাশে নিয়ে গেলেন। জীবনে প্রথমবারের মতো তিনি আমাকে বকা দিলেন। তিনি বলা শুরু করলেন- তুমি কীভাবে এ-কাজ করলে? তুমি কী চোখে দেখতে পাও না?'

প্রথমে আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম-তিনি আমাকে বকা দিচ্ছেন কেন? আমার দোষ কী? আমি বোকার মতো তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার অবস্থা দেখে

তিনি নরম হয়ে গেলেন। এরপর তিনি ব্যাখ্যা করলেন- 'তুমি কী জানতে যে আমাদের প্রত্যেকের ভাগে মাত্র দুটি কি তিনটি চাপাতি বরাদ্দ? মা কখনই তোমাকে মুখ ফুটে কিছু বলবেন না। যেহেতু তুমি খেয়েই যাচ্ছিলে, মা তোমাকে একের পর এক চাপাতি দিয়ে যাচ্ছিলেন। আর এখন পর্যন্ত মা না খেয়ে আছেন। খাওয়ার জন্য ঘরে আর কিছুই নেই।'

আমার মায়ের ক্ষুধার্ত শুকনো মুখের ছবি আমার মনে ভেসে উঠেছিল। আমার মা শতকষ্টেও মুখ ফুটে কিছু বলবেন না। আর নিজের সন্তান হলে তো মরে গেলেও কিছু বলবেন না। লজ্জায় এবং কষ্টে আমার হৃদয় ভেঙে পড়ল।

আমি নীরবে কাঁদলাম। লজ্জায় আমি কারো সামনে গেলাম না। এই ঘটনার কয়েকদিন কেটে যাবার পর আমি মায়ের মুখোমুখি হতে পেরেছিলাম।

এই ঘটনা ছিল আমার জন্য বড় এক শিক্ষা। আমি শিখলাম যে নিজের কাছের মানুষদের কথা কখনই ভুলে যাওয়া চলবে না। মা তার সন্তানের প্রতি ভালোবাসার কারণে একবারও চিন্তা না করে তার নিজের খাবার আমার পাতে তুলে দিয়েছিলেন। আর আমার ভাই আমার সামনে সেই সত্য তুলে ধরেছিলেন। এরপর থেকে আমি খেতে বসলে নিশ্চিত হয়ে নিতাম যে পরিবারের সবার জন্য উপযুক্ত খাবার আছে কি না। বিশেষ করে, মা এবং দাদিজানের।

.

আমি কোনো বড় শহরে পড়ালেখা করতে চাইছিলাম। তাই আমাকে বেশ অল্পবয়সেই ঘর ছাড়তে হয়েছিল। ফলে আমার পক্ষে বেশিদিন আমার মমতাশীল মায়ের কাছে থাকা হয়ে উঠেনি। যেমনটা আমার বন্ধুরা পেয়েছিল।

তবে আমার মায়ের মমতা এবং যত্নশীলতা আমার অন্তরে চিরকাল গেঁথে থাকবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন আমি সংবাদপত্রের 'ডেলিভারি বয়'-এর কাজ করি। আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, আমি কিভাবে এই কাজ পাই। আর কিভাবে এই কাজ চালিয়ে গেছি। তখন আমার বয়স ছিল আট বছর। আমার দিন শুরু হতো সেই ভোরবেলায়। ভোরবেলায় উঠে আমাকে গণিত শিক্ষকের কাছে পড়তে যেতে হতো। এরপর কোরআন পাঠের জন্য যেতে হতো। তারপর সংবাদপত্র বিলি। তারপর স্কুল এবং স্কুল শেষে সন্ধ্যায় বাড়িতে ফিরে এসে আবার পরবর্তী দিনের জন্য পড়া তৈরি করতে হতো। আর এই সকল কাজে মা ছিলেন আমার একমাত্র আস্থা। মা ছায়ার মতো আমার সাথে থাকতেন। ভোরবেলায় মাকে আমার আগে ঘুম থেকে উঠতে হতো। মা আমার গোসলের পানির ব্যবস্থা করে আমাকে ঘুম থেকে উঠাতেন। মা আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে আর ঘুমাতেন না। আমার ফেরার অপেক্ষায় থাকতেন। এক কি দু ঘন্টা পর আমি ফিরে এলে, বাবার হাত ধরে কোরআন শিখতে যেতাম। দিনের বেলা আমাকে এক জায়গায় থেকে অন্য জায়গায় যেতে হতো। আমি ঘরে এলে কেবল খাওয়ার সময়টুকু পেতাম। সেই খাবার সুন্দরভাবে আমার জন্য পরিবেশন করা থাকত। মা কখনও বলেননি, তবু আমি জানি যে, মা বহুবার তার নিজের ভাগের খাবারটুকুও

আমাকে দিয়েছেন যাতে আমি পেট পুরে খেতে পারি। আমি একবার মাকে এ-নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। মা আমার দিকে তাকিয়ে শুধু হেসেছিলেন। মা আমাকে বলেছিলেন-

তুমি এখন বাড়ন্ত বয়সের একটি ছেলে। এই বয়সেই তোমাকে অনেক কাজ করতে হয়।" আমার মা এমনই। তিনি আমাকে অপ্রত্যক্ষভাবে বোঝাতে চেয়েছিলেন, 'আমাকে নিয়ে চিন্তা করো না।'

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে আসার পর মা আবার আমাকে পরবর্তী দিনের প্রস্তুতি নিতে সহায়তা করতেন।

আমার সকল ভাইবোনদের মাঝে আমিই মায়ের সাথে সবচেয়ে বেশি সময় কাটাতাম। একটা ঘটনা আমার মনে পড়ে। একবার আমি মায়ের কোলে হাত রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমার মা চুপচাপ বসে আমার মাথায় এবং গালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। আমি নিজেও বুঝতে পারিনি ঠিক কখন আমার হৃদয় অশ্রুসিক্ত হয়ে গেছে। সেই অশ্রুবিন্দু হৃদয় ভেদ করে চোখে ঠাঁই নিয়েছে। আমি কিছু করতে পারার আগেই আমার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। আমার চোখ তখনও বন্ধ ছিল। তবে তাতে অশ্রুবিন্দুর কোনো সমস্যা হলো না। সেই অশ্রুবিন্দু মায়ের হাঁটুতে এবং শাড়িতে গড়িয়ে পড়ল। তবে মা আমার চুলে এবং গালে হাত বোলানো বন্ধ করলেন না। মা জানতেন সেই অশ্রুবিন্দু ঠিক কী কারণে দেখা দিয়েছে। কারণটি হলো-একটি বাচ্চা ছেলের প্রচণ্ড ক্লান্তি। যে কিনা এই ছোট্ট বয়সেই শিশু থেকে পুরুষ হওয়ার চেষ্টায় মত্ত। মায়ের নরম আঙুল আমার চুল এবং গাল স্পর্শ করছিল। সেই স্পর্শে রয়েছে শান্তি, সেই স্পর্শে রয়েছে নিজের সন্তানের কষ্ট উপলব্ধি করার অনুভূতি।

আমার মা খুবই সাধারণ একজন মহিলা। যে বেড়ে উঠেছে ভারতের দক্ষিণের ছোট্ট একটি শহরে। তবে তার মমতার তুলনা হয় না। মায়ের এই মমতা এবং ভালোবাসাকে যদি সাগরের সাথে তুলনা করা হয়, তবে সাগরের তল পাওয়া যাবে কিন্তু মায়ের মমতা বা ভালোবাসার তল পাওয়া যাবে না। আর কেবল আমার মা নয়, দুনিয়ার সকল মা এরকম। আমার মা কখনও বাড়ির বাইরে বের হয়ে শহরের ঘটনাবহুলতায় অংশ নেননি। এমন কি তিনি

কখনও কোনো পেশার সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন না। যেমনটা আজকালকার মায়েদের মধ্যে দেখা যায়। তার কাজের পরিধি ছিল তার পরিবার এবং ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে তারপরও মা আত্মত্যাগ এবং পরম নিষ্ঠার সাথে সৃষ্টিকর্তা এবং পরিবারের সকলের সেবা করে গেছেন। আমার মায়ের জীবন থেকে আমি যে শিক্ষা পেয়েছি তা হলো-

'তোমার কর্মক্ষেত্র বড় হোক বা ছোট হোক, তা কোনো ব্যাপার নয়। তোমাকে তোমার জন্য নির্ধারিত কাজের প্রতি সংকল্পবদ্ধ থাকতে হবে।'

.

আমার বাবা ১০২ বছর পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। তিনি যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তার ঘরে ১৫ নাতি-নাতনি। বাবার মৃত্যু আমাকে ভীষণ নাড়া দেয়। আমি তখন টুম্বায় কর্মরত ছিলাম। বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে আমি তৎক্ষণাৎ বাড়ি ফিরে আসি। বাড়ি এসে এসে দীর্ঘসময় আমি মায়ের পাশে

বসেছিলাম। আমি যখন ফিরে আসব মা ভরা গলায় আমাকে আশির্বাদ করলেন। আমি তখন এস.এল.ভি-৩ রকেট বানাচ্ছিলাম। তখনও অনেক কাজ বাকি। তাই মা একবারের জন্যও আমাকে থেকে যেতে বলেননি। আমার কী মাকে সঙ্গ দেওয়া উচিত ছিল?

আমার কী উচিত ছিল না নিজের কর্মব্যস্ততা ফেলে এই বৃদ্ধ মহিলার সাথে কিছুটা সময় কাটানো, যাকে আমি আর কোনোদিন দেখতে পাইনি। আমি বহুবার নিজেকে এই প্রশ্ন করেছি। তবে কোনো উত্তর পাইনি।

বাবার মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই মাও মারা গেলেন। এ-কথা বললে বেশি মানাবে যে-মা আর বেশিদিন বাঁচতেনও না সেই মানুষটাকে ছাড়া। যার সাথে তিনি দীর্ঘ ৮০টা বছর কাটিয়েছেন।

মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে আমি আবার রামেশ্বরামে এলাম। মায়ের অগণিত স্মৃতি আমাকে ঘিরে ধরল। যে দুজন মানুষ আমাকে তৈরি করেছেন, আমার চিন্তা চেতনা এবং ব্যক্তিত্ব গড়ে দিয়েছেন-তাদের কেউই আর নেই। তাদেরকে ছাড়াই আমাকে বাকি জীবনটা কাটাতে হবে। তবে আমি জানতাম

তাদের একজনকে ছাড়া অন্যজন বাঁচতে পারবে না। আর এই কথা ভেবেই আমি স্বস্তি পেলাম। আমি মসজিদে গেলাম। এই মসজিদেই আমি আমার বাবার কাছে পড়তে শিখেছি। আযানের ধ্বনি শোনা গেলেই বাবা-মা পুরো পরিবারকে জড়ো করে নামাজে পাঠাতেন। আর এগুলো এখন কেবল স্মৃতি।

আমার সুন্দর শৈশব, কালের গর্ভে বিলীন পিতা-মাতা, একজন মমতাশীল মা-যিনি নিজের সন্তানের গভীর অনুভূতি বুঝতে পারতেন, সবই এখন স্মৃতি হয়ে এই হৃদয়ে গেঁথে আছে।

আমার বোন জোহরা

মাই জার্নি : স্বপ্নকে বাস্তবতা প্রদান – এ পি জে আবদুল কালাম আমার বোন জোহরা

আমার বোন জোহরা

আমি আগেই বলেছি আমাদের একান্নবর্তী পরিবার ছিল। সেই একান্নবর্তী পরিবারের দশ ভাইবোনের একজন আমি। এছাড়াও পরিবারে অনেক চাচাত ভাইবোন ছিল। শুধু এখানেই শেষ নয়। আমাদের সাথে অনেক নিকট আত্মীয়ের বাচ্চাকাচ্চারাও থাকত। আমরা কখনই তাই একাকিত্ব

বা একঘেঁয়েমি নামক কোনো অনুভূতি কী তা বুঝতেও পারিনি। সারাটা সময় জুড়েই আমরা কিছু না কিছু করতেই থাকতাম। এই উঠলাম গাছে, আবার কিছুক্ষণ পরেই কোনো খেলা জুড়ে দিতাম। আবার কোথাও পিকনিকে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে বসতাম।

আমরা ছিলাম একদল চঞ্চল, দুষ্টু ছেলেমেয়েদের দল। আমরা সবসময়ই আনন্দে থাকতাম। এবং যে কোনো প্রয়োজনে একে অপরের পাশে থাকতাম।

আমার বড় বোনের একজন হলেন জোহরা। আমাদের দেশের আর পাঁচ দশটা মেয়ের মতোই ও বেড়ে ওঠে। জোহরা স্কুলে গিয়েছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাও অর্জন করেছে। পাশাপাশি জোহরা ঘরের কাজেও মা ও দাদিজানকে সাহায্য করত। আর আমার মায়ের একমাত্র সার্বক্ষণিক সঙ্গ ছিল জোহরা। মা মেয়ের সম্পর্ক ধীরে ধীরে বন্ধুত্বে পরিণত হয়। সংসারের যাবতীয় কাজ যেমন-ধোয়া মোছা, রান্না-বান্না, ছোটদের দেখাশোনা সব কিছুই মা এবং জোহরা মিলে সামলাত। মায়ের মতো জোহরাও আমাকে একটু বিশেষভাবে পছন্দ করত। এর পেছনের একটা কারণ হলো আমি কিছুটা ব্যতিক্রম দেখতাম। আমি স্বপ্ন দেখতাম এবং আমার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে চাইতাম। আমি আমার এবং সঙ্গি সাথিদের মতো অতটা অহংকারি ছিলাম না। প্রায়ই সময়ই আমি কোনো দুষ্টুমির ফন্দি না এঁটে কোনো বই বা পত্রিকা পড়ে সময় পার করতাম। জোহরা তার সাধ্যমতো আমার যত্ন করত। সে খেয়াল রাখত যাতে তার আদরের ছোট্ট ভাইটি দুষ্টু ছেলেদের সাথে মিশে দুষ্ট না হয়ে যায়।

.

আমি যখন ছোট ছিলাম তখনই আমার এক চাচাত ভাই আমাদের পরিবারের সাথে জড়িয়ে পরে। তার নাম আহমেদ জালালউদ্দীন। আমাদের ছোট্ট এলাকায় সে মুক্ত বাতাসের মতো প্রভাব ফেলতে থাকে। সে ভালোই পড়ালেখা করেছে। এবং সে ইংরেজি পড়তে ও লিখতে পারে। এলাকার সবাই পরিবারের সবাই তার ওপর ভরসা করতে পারত। জীবন নিয়ে তার বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। রামেশ্বরামের বাইরেও যে আরো সুন্দর জীবন অপেক্ষারত আছে তা তিনি জানতেন এবং সেই অনুযায়ী নিজেকে প্রস্তুত রাখতেন। তিনি আমাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এবং এক সময়ে আমাদের পরিবারের অংশ হয়ে যান।

জালালউদ্দীন আমাকে অনেক পছন্দ করতেন। জালালউদ্দীন আমার কৌতূহলের প্রশংসা করতেন। এবং আমার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। আমার মাথায় সারাদিনই আশেপাশের জিনিস নিয়ে প্রশ্ন জাগত। যেমন-পাখি কেন ওড়ে? বৃষ্টি কীভাবে তৈরি হয়? ইঞ্জিন কীভাবে কাজ করে? এরকম নানান প্রশ্ন।

জালালউদ্দীনই প্রথম বুঝতে পারেন যে, রামেশ্বরাম স্কুলে থেকে আমার পক্ষে আমার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তিনি আমার বাবার সাথে এ-বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি আমার বাবাকে পরামর্শ দেন, আমাকে রামনাথপুরে পাঠানোর। সেখানে আরো বড় এবং ভালো স্কুল আছে।

এভাবেই আমার জীবন এক নতুন দিকে মোড় নিল। আমি রামনাথপুরে চলে গেলাম। রামনাথপুরে পড়ালেখা শেষ করে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, মাদ্রাজ (বর্তমান চেন্নাই)-এ চলে আসব। সেখানে মাদ্রাজ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (MTT)-তে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ব। আমি রামনাথপুরে থাকাকালীন সময়েই জোহরা এবং আহমদ জালালউদ্দীনের বিয়ে হয়। আমার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের ক্ষেত্রে এই দুজনের অবদান সবচাইতে বেশি।

জোহরা সংকল্পবদ্ধ ছিল আমাকে নিয়ে। যেন আমি আমার স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষাকে দৃঢ়ভাবে গড়ে তুলতে পারি। আর জালালউদ্দীন আমার দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করতেন।

আমাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা বেশি ভালো ছিল না। আমাদের পরিবার তখনও আমার বাবার আয়ের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এই অবস্থায় আমার MTT-তে ভর্তির জন্য ৬০০ রূপি কীভাবে জোগাড় হবে?

বর্তমান সময়ে ৬০০ রূপি টাকা কোনো বড় অঙ্কের টাকা না। খুবই সামান্য পরিমাণ টাকা। তবে সেই সময়ে এই ৬০০ রূপিই ১ লাখ রূপির সমতুল্য ছিল।

এই পরিস্থিতির সামনে এসে আমি আমার বোনকে সত্যিকার অর্থেই চিনতে পারলাম। তার এক কথা যে, তার ছোটভাইকে কোনো কিছুই আটকাতে পারবে না। সে তার স্বামীকেও একই কথা বলল। আমার বাবা-মা জোহরার বিয়ের সময় ওকে দেয়ার জন্য কিছু গহনা রেখে দিয়েছিলেন। ভারতের মহিলারা ঐতিহ্য অনুযায়ী ঘরে গহনা পড়ে থাকে। আর অনেকেই এই স্বর্ণের গহনাপাতি বিপদের জন্য রেখে দেয়। যাতে বিপদ এলে ভরসা পাওয়া যাবে। তাই হঠাৎ খারাপ দিন এলে এই গহনা জামানত হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

আমার বোন সিদ্ধান্ত নিতে এক মুহূর্ত দেরি করেনি। একটিবার ইতস্তত পর্যন্তও করেনি। একবারও ভাবেনি যে, তার নিজের পরিবারের জন্য এ-গহনা দরকার হতে পারে। জোহরার তখন নিজের আলাদা পরিবার আছে। সে একজন স্বর্ণকারের কাছে যায়। সেখানে তার গহনা বন্ধক রেখে আমার MTT – তে ভর্তির টাকা এনে দেয়।

এই ঘটনা আমার হৃদয় স্পর্শ করে যায়। আমার জন্য যারা আত্মত্যাগ করেছেন তার মধ্যে জোহরাই প্রথম। জোহরাই আমার ভর্তির সমস্যার সমাধান

করে দেয়। ও ওর সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করে গিয়েছে। জোহরা জানে ওর ভাই কঠোর পরিশ্রম করবে। তার ভাইয়ের ওপর পূর্ণ আস্থা ছিল। সে জানত যে, তার ভাই একজন সেরা ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবে।

জোহরার গহনা বন্ধকের টাকা দিয়ে আমি MIT-তে ভর্তি হলাম। আমি উপার্জন শুরু করার পরই প্রতিজ্ঞা করলাম যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি জোহরার গহনা ছাড়িয়ে এনে দেব। এবং আমি তা করতে পেরেছি। আমি ভালো ফলাফলের জন্য একই সাথে বৃত্তি স্কলারশিপ পেয়ে গেলাম।

মায়ের মতো, জোহরাও পুরোটা জীবনই রামেশ্বরামে কাটে। জোহরা একজন সাধারণ ভারতীয় নারী। প্রতিটি ভারতীয় নারীর মতো জোহরাও সহ্যশক্তি এবং মমতার প্রতীক। আর পাঁচটা ভারতীয় নারীর মতো জোহরাও কখনও নিজেকে নিয়ে ভাবেনি। যে ভেবে গেছে তার পরিবার, তার ভাই এবং তার স্বামীর স্বপ্ন নিয়ে। সে তার ভাই, স্বামী, পিতার আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্ন পূরণ করে গেছে। তবে একটিবারের জন্যও নিজের স্বপ্ন বা নিজেকে নিয়ে ভাবেনি।

আমি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি, জোহরার কী কোনো স্বপ্ন ছিল না?

নিয়তি, অবস্থা এবং প্রথা তাদেরকে বারবার পরীক্ষা করতে থাকত। এবং বরাবরের মতো তাকে তা ত্যাগ তিতিক্ষা সংরক্ষণ এবং তৈরি করে যেতে হবে। তারপর সে তার পরিবারের জন্য ভালোবাসার অভাব হতে দেবে না।

আমার শিক্ষক : আহমেদ জালালউদ্দীন

মাই জার্নি : স্বপ্নকে বাস্তবতা প্রদান – এ পি জে আবদুল কালাম আমার শিক্ষক : আহমেদ জালালউদ্দীন

আমার শিক্ষক আহমেদ জালালউদ্দীন

আমার জীবনের বিশেষ কিছু মুহূর্তে বিশেষ কিছু লোকের দিক নির্দেশনা পাই। এরা আমার জীবন গঠন এবং চিন্তাভূবনে বিরাট ভূমিকা পালন করেন। এমন কি অনেক সময় এদের সহযোগিতায় আমার জীবন ভিন্ন মাত্রা পেয়ে নতুন পথে পরিচালিত হতে থাকে। আমার গড়ার পেছনে এই সকল শিক্ষক স্থানীয় লোকদের অবদান সবচাইতে বেশি। আমি এদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। আমি যদি অনেকটা সময় পেতাম তাহলে আমি সেই পুরোটা সময়ই এদের কথা চিন্তা করে ব্যয় করতাম। তারা প্রত্যেকেই সূর্যের মতো। এদের আলিঙ্গনে জীবন এক নতুন উষ্ণতা এবং শক্তি পায়।

এমনই একজন শিক্ষক হলেন-আহমেদ জালালউদ্দীন। আমি যখন ছোট ছিলাম। আমার বাবা নতুন একটা ব্যবসা শুরু করতে চাচ্ছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি নৌকা তৈরি করে ফেরী পারাপারের ব্যবসায় করবেন। নিজের সামনে নৌকা তৈরি হতে দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। একের পর এক কাঠ জোড়া লাগানো হচ্ছিল। আর প্রতিটি কাঠ

যথাপযুক্ত স্থানে বসানোর সাথে সাথে। নৌকার অবয়ব পরিষ্কার হয়ে আসছিল। যখন আমি নৌকার কাজ দেখতে, নৌকা তৈরির স্থানে যেতাম। সেখান থেকে সরতে চাইতাম। আমি এক মনে নৌকা তৈরির প্রক্রিয়া দেখতে থাকলাম।

জালালউদ্দীন তখন রামেশ্বরামে। তিনি বাবাকে সাহায্য করতে এসেছিলেন। নৌকা তৈরিতে সাহায্য। তিনি নৌকার প্রতি আমার আগ্রহের ব্যাপারটা লক্ষ করেছিলেন। তিনি মোটেও অন্যসব বয়স্ক লোকের মতো ছিলেন না।

অধিকাংশ বয়স্ক লোকই তাদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এতটাই ব্যস্ত যে, কাজ করার সময় ছোটদের সাথে কোনো কথা বলার প্রয়োজন মনে করেন না। কেউ আগ্রহবোধ করলেও না। তবে জালালউদ্দীন ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমার সাথে কিছুটা সময় কাটাতেন। তিনি নৌকার কাজ নিয়েই আলোচনা করতেন।

আমরা নৌকা নিয়ে বিভিন্ন আলাপ আলোচনা করতাম। কেমন করে নৌকা তৈরি হবে। কীভাবে রং করা হবে। আর কী কী কাজ বাকি আছে এইসব। এভাবেই একটি ছোট ছেলে এবং একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের মধ্যে গড়ে ওঠে অদ্ভুত রকমের বন্ধুত্ব। জালালউদ্দীন বয়সে আমার থেকে ১৫ বছরের বড় এবং তার জ্ঞানও আমার তুলনায় অনেক বেশি।

জালালউদ্দীনও রামেশ্বরামে থেকে গেলেন। আর আমাদের বয়সের পরিবর্তনে সাথে সাথে, আমাদের আলোচনায়ও ভিন্নতা আসতে থাকল। দিন কেটে বছর পেরোল। জালালউদ্দীনের সাথে আমার বোন জোহরার বিয়ে হলো। আমাদের সম্পর্ক আরও বেশি গভীরতা পেল।

জালালউদ্দীনের কথা যদি মনে করি, তবে আমার প্রথম মনে পড়বে আমাদের দুজনের রামেশ্বরামের রাস্তায় হেঁটে বেড়ানোর কথা। প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমরা হাঁটতে বের হতাম। আমাদের বাড়ি ছিল মস্ক স্ট্রিটে। যেখানে থেকেই আমরা পথচলা শুরু করতাম। হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্রের তীরে পৌঁছে যেতাম। শহর এ-সময় ব্যস্ত থাকত। মন্দিরে পূণ্যার্থিদের আসা-যাওয়া লেগে থাকত।

আমাদের প্রথম যাত্রাবিরত পড়ত শিবমন্দিরে। এখানে আমাদের গতি কিছুটা কমে যেত। পূণ্যার্থিদের ভিড়ের কারণে গতি কিছুটা শ্লথ হয়ে আসত। পূণ্যার্থিদের কেউ হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করতে বসত। আবার কেউ কেউ মন্দিরে প্রতিটি সিঁড়ির ধাপে হাত ঠেকাতে ঠেকাতে আসত। যারা সাথে করে বৃদ্ধ মা- বাবা বা আত্মীয়স্বজন নিয়ে এসেছেন, তারাও সাবধানে ধীরে ধীরে পথ চলত।

মন্দির এলাকায় পূণ্যার্থিদের মাঝে এলেই আমাদের চিন্তা ভাবনা এবং আলাপ আলোচনার বিষয়ে পরিবর্তন আসত। আমাদের মাঝে তখন আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা শুরু হয়ে যেত। অধিকাংশ সময়ই আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু থাকত সৃষ্টিকর্তা।

সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে জালালউদ্দীনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কিছুটা ভিন্ন। মূলত আমাদের বাবার যেমনটা ছিল, সেরকম ছিল না।

.

আমার বাবা ছিলেন একজন ধার্মিক লোক। তিনি ধর্মের প্রতিটি নিয়মকানুনই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করতেন। কেবল সৃষ্টিকর্তার বাধ্যবাধকতার কারণে তিনি ইবাদত করতেন না। তিনি পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতেন, তার নিজের জন্য তার ইবাদত করা প্রয়োজন।

শ্বাস-প্রশ্বাস এবং খাদ্যগ্রহণ যেমন মানুষের স্বাভাবিক প্ররোচণা, নামায- রোজাও আমার বাবার কাছে ততটাই স্বাভাবিক ছিল।

জালালউদ্দীনও একজন নিষ্ঠাবান ধার্মিক লোক। তবে তিনি সৃষ্টিকর্তাকে বন্ধু বলে বিবেচনা করতেন। যেমন করে আমরা বন্ধুর সাথে কথা বলে থাকি তিনি তেমনভাবে সৃষ্টিকর্তাকে নিজের অসুবিধা এবং সমস্যাগুলো জানাতেন। জালালউদ্দীনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তিনি যদি সৃষ্টিকর্তাকে তার সমস্যার কথা জানান, সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই তার সমাধান দেবেন।

মন্দির পার হওয়ার সময় আমি সমান মনোযোগে পূণ্যার্থিদেরকে নিজেদের প্রথা পালন করতে দেখতাম। আবার জালালউদ্দীনের কথাও শুনতাম। আমার মাথায় এই দু ধরনের বিশ্বাস একত্রে মিলে যেত।

রামেশ্বরামে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আগত পূণ্যার্থি, যারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এসেছে এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় প্রার্থনা করে তাদের এবং রামেশ্বরামে বসবাসরত লোকজনের প্রার্থনা কি একাধিক সৃষ্টিকর্তার কাছে পৌঁছায়? কারণ, এক এক সম্প্রদায়ের বিশ্বাসও এক এক ধরনের। না এমনটা সম্ভব হবে না। আমি বিশ্বাস করি যে, মানুষের ধর্ম যাই হোক না কেন, সৃষ্টিকর্তা এক এবং অদ্বিতীয়। তবে আমি মাঝে মাঝে ভেবে অবাক হই আমার বন্ধুর বিশ্বাস দেখে। অবশ্য আমার অবাক হওয়ার বিষয়টা আমি তার কাছে গোপন রেখেছি। আমার বন্ধু, জালালউদ্দীনের সাথে সৃষ্টিকর্তার কী কোনো বিশেষ সম্পর্ক আছে। যার কারণে সে সৃষ্টিকর্তাকে সর্বত্র খুঁজে পায়। এবং অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দের সাথে তাকে নিজের সমস্যার কথা বলে যায়।

জালালউদ্দীন মোটেই উচ্চশিক্ষিত নয়। তিনি কেবল অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছে। নিজের পরিবারটাকে টিকিয়ে রাখতে তাকে কাজে নামতে হয়। তাই আর তার পড়ালেখা করা হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু, তিনি রামেশ্বরামের হাতেগোনা কিছু লোকজনদের মধ্যে ছিলেন। ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান রাখতেন। তিনি ইংরেজি ভাষা লিখতে ও পড়তে পারতেন। তাই এলাকার মানুষের তাকে প্রয়োজন ছিল। এলাকার মানুষজন জালালউদ্দীনের কাছ থেকে দাপ্তরিক চিঠিপত্র লিখিয়ে নিত। এলাকার লোকজন তাকে ভীষণ সম্মান করত। আর মানুষজনের চোখে তার জন্য সম্মান দেখে আমিও তার মতো হতে চাইতাম। এবং অনেক পড়ালেখা করতে চাইতাম। আর যদি জালালউদ্দীনের দিক থেকে দেখি, তাহলে আমি বলব শিক্ষিত হওয়ার কারণে জালালউদ্দীন আমার মাঝে কৌতূহল এবং জ্ঞানের স্পৃহা ধরতে পেরেছিলেন। সেই দিনগুলো সবকিছু, আন্তরিক অর্থেই সবকিছুর প্রতি আমার আগ্রহের

সীমা ছিল না। আর জালালউদ্দীনই সেই ব্যক্তি যিনি আমার সকল প্রশ্নের জবাব দিতেন। আমি তাকে এক নাগাড়ে প্রশ্ন করতেই থাকতাম। তিনি অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে আমার কথা শুনতেন এবং আমার প্রশ্নের উত্তর দিতেন। তিনি প্রাত্যাহিক জীবনধারার বাইরে যা আছে তা সম্পর্কে আমাকে জানাতেন। যেমন, প্রকৃতি, মহাকাশ, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, বই এবং বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব এভাবেই তিনি আমার জ্ঞানের চক্ষু খুলে দেন।

আমি প্রায়ই নিজেকে কিছু প্রশ্ন করতাম। তা হলো—কী সে আমাদের ব্যক্তিত্ব তৈরি হবে? প্রকৃতি মানুষকে কতটা গড়ে দেয়। আর মানুষ জন্মগতভাবে কতটা বিশেষত্ব নিয়ে আসে? আমি যদি সেই দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকাই তবে আমি আঙুল দিয়ে কাছের মানুষগুলোর গুণাগুণ চিহ্নিত করতে পারব। আর তাদের এই সকল গুণাবলিই তাদের সঙ্গের কারণে আমার মাঝে স্থানান্তরিত হয়েছে। আমার মা বাবার কাছে থেকে আমি সততা, নিয়মাবর্তিত, ভক্তি এবং পরোপকারি হবার শিক্ষা পেয়েছি। আর জালালউদ্দীন এবং আমার আরেক চাচাত ভাই শামসউদ্দীনের কাছে আমি শিখেছি—'প্রতিটি মানুষই বিশেষ কিছু গুণাবলি নিয়ে জন্মায়। এগুলো তার মাঝে নিহিত থাকে। এরা আমার মাঝে এক ধরনের জ্বলন্ত শিখা দেখতে পায়।' আমাকে তারা উৎসাহ দেয় এবং গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

তারা মোটেও জটিল মানুষ ছিলেন না। তারা ছিলেন সহজ সরল এবং স্পষ্টভাষী কিছু মানুষ। আমার অনেক কিছুই যেমন-চিন্তা ভাবনা, তাদেরকে বলা লাগত না। তারা নিজে থেকেই বুঝতে পারতেন। তারা সেগুলোকে আমার ভেতর থেকে বের করে এনে আমার জীবনের লক্ষ্য সুন্দর করে গড়ে তুলতে সহায়তা করতেন।

আমি যখন বেড়ে উঠতে থাকি, জালালউদ্দীন প্রথম আমাকে রামেশ্বরামের গণ্ডি ভেদ করে বেরিয়ে আমার উৎসাহ দিয়েছিলেন। যখন আমি আরোও বড় শহরে, ভালো স্কুলে আমার পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাপোষণ করলাম। তিনিই তার ব্যবস্থা করে দেন।

এমন কি তিনি আমার সাথে রামনাথপুরে পর্যন্ত গিয়েছিলেনও। আমি রামনাথপুরের Schwartz High School-এ মানিয়ে নেয়ার পর তিনি রামেশ্বরামে ফিরে গিয়েছিলেন। যে সকল ছেলেরা আগে কোনো বড় শহরে বাস করেনি। অর্থাৎ নিজ স্থান ছেড়ে অন্য কোথাও বাস করার অভিজ্ঞতা নেই তাদের জন্য জায়গা পরিবর্তনের সাথে সাথে অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়। আমিও তার ব্যতিক্রম ছিলাম না। তাই রামনাথপুরে এসে অমি বড় ধরনের পরিবর্তনের সম্মুখিন হয়েছিলাম।

আমার পরিবারকে ছেড়ে অন্য একটি জায়গায় বাস করতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। আমার বাড়ি, রামেশ্বরামের মনোরম পরিবেশ, মা, মায়ের হাতের রান্নার কথা বার বার মনে পড়ছিল। সেই সময় জালালউদ্দীন জাদুকরের মতো ভূমিকা পালন করলেন। তিনি আমাকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন হতে শেখালেন। তিনি বললেন, ভালো স্কুলে পড়াশুনা করতে হলে আমাকে নিজের আবেগ অনুভূতির ওপর নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে। যখনই আমার বাড়ির কথা মনে পড়ত বা খারাপ লাগত, তার

উপদেশবাণি মনে করতাম। আমি নতুন করে উদ্যোগ এবং অনুপ্রেরণা পেতাম। আমি নিজেকে এই সকল ছেলেমেয়েদের সাথে বিবেচনা করতাম যারা বোর্ডিং স্কুলে থেকে লেখাপড়া করে।

আমি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগ পর্যন্ত এই মানুষটি আমাকে সাহায্য করে গেছেন। প্রাপ্তবয়স্ক বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছি নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার সক্ষমতার পর্যায়কে। আমার পথে তিনিও আমার সাথে থেকে আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়ে গেছেন। আমি যখনই হোঁচট খেয়েছি, তিনি আমাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করেছেন। যখন আমার মনে হচ্ছিল, 'আমি পারব না', তখন আমার মাঝে উদ্যমের সঞ্চার করেছেন তিনি।

আমি এমন কিছু করেছিলাম যা মাত্র ২০ বছর আগেও রামেশ্বরামে কেউ করার স্বপ্ন পর্যন্ত দেখতে সাহস পায়নি। আমি একটি ট্রেনিং প্রোগ্রামে জাভায় যাচ্ছিলাম। ট্রেনিং প্রোগ্রাম চলেছিল ৬ মাস। জালালউদ্দীন এবং সামসউদ্দীন বোম্বের (বর্তমান মুম্বাই) সান্টা ক্রুজ এয়ারপোর্ট পর্যন্ত আমার সঙ্গে আসে। এই স্মৃতি আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। ততদিনে আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেছি। Indian National Committee for Space Reasearch (INCOSPA)-এ একজন রকেট সায়েন্টিস্ট হিসেবে যোগদান করেছিলাম। তারাই আমাকে যুক্তরাষ্ট্রের NASA-তে ট্রেনিংয়ের জন্য পাঠাচ্ছিল। জালালউদ্দীন এবং সামসউদ্দীন আমাকে বিদায় জানাতে এয়ারপোর্টে পর্যন্ত আসেন। আমার উত্তেজনা তাদের মাঝেও সঞ্চারিত হচ্ছিল। তারপরও তারা নিজেরা শান্ত থেকে আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। আমার মনে পড়ে এয়ারপোর্টে একেবারে শেষমুহূর্তে আমি তাদের দিকে ফিরে তাকাই। আমি তাদের চোখে স্পষ্টভাবে আশাবাদ ও অনুপ্রেরণা দেখতে পাই। তাদের সেই অনুভূতি আমাকেও ছুঁয়ে যায়।

তারা এমন দুজন মানুষ যারা আমার মাঝের ভালোটাই বের করে আনতে পেরেছেন এবং আমাকে সর্বদা সঠিক পথে পরিচালিত করতে পেরেছেন। সেখানে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আমি আর আমার আবেগ এবং তাদের প্রতি আমার ভালোবাসা চেপে রাখতে পারলাম না। আমরা চোখ বেয়ে পানি পড়তে লাগল। ভেজা চোখ নিয়েই আমি তাদেরকে একে একে আলিঙ্গন করেছিলাম। তখন জালালউদ্দীন আমাকে বলেছিলেন, ' আব্দুল, আমরা সবসময়ই তোমাকে ভালোবাসা দিয়ে গেছি। তোমার ওপর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমরা তোমাকে নিয়ে গর্বিত।' তার এই কথাগুলো ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

.

এখন সেদিনগুলোর কথা মনে পড়লে, আমি জালালউদ্দীনের অবদান বুঝতে পারি। তিনি কেবল আমাকে হাত ধরে হাঁটতে শেখাননি, তিনি আমাকে শিখিয়েছেন কী করে বাঁচতে হয়। তার প্রভাবের বশবর্তী হয়েই আমি একজন সম্পূর্ণ মানুষ হতে পেরেছি। নিজের বুদ্ধি এবং সৃজনশীলতাকে কাজে লাগাতে শিখেছি। যখন আমি আমার পরিবার থেকে অনেক অনেক দূরে ছিলাম, তখনও তার প্রভাব আমার মাঝে রয়ে গিয়েছিল। আমি এই দুনিয়ার নিজের পথ করে নিতে সক্ষম হয়েছি।

তিনি যে শুধু আমাকে জীবনের শিক্ষা দিয়েছেন তাই কিন্তু নয়। তিনি আমাকে কঠিন বাস্তবতা 'মৃত্যু'র শিক্ষাও দিয়েছেন। যখন আমি Indian Space Research Organization (TSPO) -এর SLV-3 প্রজেক্টে কাজ করছিলাম। তখন খবর এলো আমার বন্ধু, দিক-নির্দেশক আর এ-দুনিয়াতে নেই। তার মৃত্যুতে আমি বড় ধরনের ধাক্কা খেলাম। জালালউদ্দীনের এখনও মৃত্যুর বয়স হয়নি। আমি তাই এই খবর শুনে নির্বাক হয়ে রইলাম। এমনটা কীভাবে হলো? আমরা সবাই বেঁচে থাকতে এই লোকটা কেন মারা গেল? তার মৃত্যুর পর আমি কি প্রলাপ বকেছি তা আর মনে নেই। একটা সময়ের জন্য আমি অনুভূতিশূন্য হয়ে পড়েছিলাম। অবশেষে আমি নিজেকে শক্ত করলাম। আমার সহকর্মীদের জানালাম যে, আমি রামেশ্বরামে যাব।

বাড়ি ফেরার পরে আমি বাসে যাচ্ছিলাম। পাথুরে শহরে রাস্তায় শত শত লোকের কোলাহল এবং প্রকৃতির গুঞ্জনের মাঝে আমার নিজেকে একা মনে হতে লাগল। সম্পূর্ণ একা। আমাদের সবার জীবনেই এমন একটা সময় আসে যখন আমাদেরকে নিজেদের শৈশব পেছনে ফেলে সামনে এগোতে হয়। আমার জন্য সেই সময়টাই সামনে এগোনোর সময় ছিল।

জালালউদ্দীনের সাথে সাথে আমার জীবনের বড় একটা অংশের সমাপ্তি ঘটেছে। সেই আমার মাঝের ছেলেটিও চিরতরে হারিয়ে গেল। যার কি না দিক নির্দেশনার দরকার ছিল, যে কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে প্রশ্ন করতেই থাকত। যে জানত যে তাকে নির্দেশনা দেয়ার জন্য একজন বিশেষ লোক রয়েছে।

যখন আমি নিজের চোখ বন্ধ করলাম, আমার চোখের সামনে সকল স্মৃতি ফিরে আসল। আমি স্পষ্ট দেখছিলাম জালালউদ্দীনকে, আমার বই কেনার জন্য টাকার ব্যবস্থা করেছেন-সান্টা ক্রুজ এয়ারপোর্টে আমাকে বিদায় জানাচ্ছেন, আমার চোখ বেয়ে পানি পড়তে শুরু করল। এই কান্না কেবল তারাই কাঁদতে পারবে যাদেরকে ছোটবেলায় কেউ গভীর ভালোবাসা দিয়ে বড় করেছিল। আমি আবারও স্মৃতির ভূবনে চলে গেলাম। দেখতে পেলাম যে, তিনি আমার সাথে আমাদের ছোট্ট শহরে হেঁটে বেড়াচ্ছেন। তিনি আকাশের চাঁদ-তারার দিকে আঙুল তুলে দেখালেন। আমাকে ব্যাখ্যা করলেন কেন সূর্য এবং চাঁদ আকাশে দেখা যায় এবং কীভাবে অস্ত যায়।

আমি বাড়ি পৌঁছে দেখলাম আমার বোন আকুল নয়নে কাঁদছে। তার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল আমার ছোট্ট মেহবুব। মেহবুব আমার ভাতিজী। তার বাবার অকাল মৃত্যুর ছায়া তার মাঝেও দেখা যাচ্ছিল। আমি আমার বাবার সাথে দেখা করলাম। বাবার বয়স তখন একশ হবে। বাবাকে দেখে প্রথমবারের মতো আমার মনে হচ্ছিল, বাবার বয়স হয়ে গেছে। তার আদরের জামাইয়ের মৃত্যুর শোক রাতারাতি এই বয়স বৃদ্ধির জন্য দায়ী। আমরা জালালউদ্দীনকে কবর দিলাম। তাকে কবর দিয়ে আসার পর আমি আর নিজের চোখের পানি ধরে রাখতে পারলাম না। আমার কাছে মনে হচ্ছিল, আমি আমার স্মৃতিমহলে ঘোরের মধ্যে হেঁটে যাচ্ছি! চারদিক ঘন কুয়াশা।

কবর দিয়ে বাড়ি ফিরে আসার পর আমার বাবা আমার পাশে বসলেন। তিনি আমার হাত ধরলেন। আমি প্রথমবারের মতো লক্ষ করে দেখলাম যে বাবার চোখেও পানি। এবং তিনি তার কান্না লুকানোর কোনোরকম চেষ্টাই করছিলেন না। বাবা বললেন-

‘কালাম, তুমি কী ছায়ার নড়াচড়া দেখতে পাও? সৃষ্টিকর্তা যদি চাইতেন ছায়া নড়াচড়া করতে পারত না। কারণ তার ইচ্ছার বাইরে কিছুই সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি কী করেছেন জানো? তিনি সূর্যকে দিয়ে ছায়াকে নিয়ন্ত্রণ করেন। বেলা যত বাড়তে থাকে ছায়া ততই কমতে থাকে। তিনি রাত সৃষ্টি করেছেন আমাদের বিশ্রামের জন্য।’

সৃষ্টিকর্তা জালালউদ্দীনকে এক গভীর নিদ্রায় শায়িত করেছেন। এক স্বপ্নবিহীন নিদ্রায় আছেন জালালউদ্দীন। বিশ্রাম করছেন তিনি। সৃষ্টিকর্তা না চাইলে কোনো কিছুই সম্ভব না। আর মানুষ জন্মমৃত্যু নিয়েই এই পৃথিবীতে আসে। তাই সৃষ্টিকর্তার ওপর আমাদের বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

আমি বসে বসে বাবার জ্ঞানের কথাগুলো ভাবছিলাম। মৃত্যুকে ভয় পেলে চলবে না। আমি কখনই মৃত্যুকে ভয়ের চোখে দেখিনি। জন্ম-মৃত্যু দুটোই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। তবুও, মৃত্যুর কারণে যে দুঃখ হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে ফেলে তা থেকে সহজে নিস্তার লাভ করা সম্ভব নয়। আমাদের সবাইকেই এক সময় না এক সময় মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তবে জালালউদ্দীনের মতো যারা অল্পবয়সে মারা যান, যে কিনা নিজের সন্তানদের বড় হতে দেখেনি, নিজের সন্তানদের বিয়ে হতে দেখেনি, নাতি-নাতনির সুখ পায়নি—তাহলে সেই মৃত্যু এক ধরনের শোকের ছায়া ফেলে হৃদয়ে। আর সেই শোকই বাস্তবতায় রূপ নেয়। সেই কঠিন বাস্তবতা নিয়েই বেঁচে থাকতে হয়।

আমার বন্ধু জালালউদ্দীন একজন সাধারণ মানুষ তবে শিক্ষক এবং বন্ধু হিসেবে তিনি অসাধারণ। তিনি ভালোবাসা, সরলতা এবং বোধগম্য দ্বারা তার চারপাশের মানুষগুলোর জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতেন। প্রতিটি শহরে, গ্রামে এবং দেশে তার মতো কিছু মহৎপ্রাণ লোক থেকে থাকে। আমি অনেক ভাগ্যবান যে, আমি তার সান্নিধ্য পেয়েছি। তিনি না হলে আজকের আমি আর আমি হতে পারলাম না।

আমার জীবনের ব্যর্থতাগুলো

মাই জার্নি : স্বপ্নকে বাস্তবতা প্রদান – এ পি জে আবদুল কালাম আমার জীবনের ব্যর্থতাগুলো

আমার জীবনের ব্যর্থতাগুলো

আমার ঘটনাবহুল জীবনে আমি অকল্পনীয় সাফল্য অর্জন করেছি। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির যে সকল আবিষ্কার আমাদের দেশের উন্নয়নে বিরাট অবদান রেখেছে আমি তার অংশ হতে পেরেছি। এমনকি

দেশের সর্বোচ্চ অফিসের প্রধান হওয়ার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। আমার জীবনের এই সাফল্যগুলোর অনেকগুলোই একান্তই আমার। আবার অনেকগুলো দলীয়। আর যে দল সাফল্য অর্জন করেছে, আমিও তার অংশ ছিলাম। সেই দলগুলো ছিল অসামন্য সব মেধা নিয়ে গঠিত।

তারপরও আমি বলব যে, কেউ যদি জীবনে ব্যর্থতার তিক্ত অনুভূতি লাভ না করে, তার পক্ষে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন কখনই সম্ভব হবে না। জীবন নামক মুদ্রার উভয় পিঠ দেখার অভিজ্ঞতা আমি লাভ করেছি। আমার জীবনের এমন অনেক মুহূর্ত আছে যখন আমি ব্যর্থতার হতাশায় ডুবে ছিলাম। জীবনের এই কঠিন বাস্তবতা থেকে আমি অনেক প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করেছি। সাফল্যের পাশাপাশি, ব্যর্থতা থেকে লব্ধ শিক্ষাও আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ, এই শিক্ষাগুলোর কারণেই আমি জীবনের কঠিন পরিস্থিতিতে নিজেকে প্রমাণ করতে পেরেছি। অতঃপর সাফল্যের আসনে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছি। এই ব্যর্থতার একটি ঘটনা ঘটে, যখন আমি MIT-তে পড়ালেখা করছিলাম। আমি এরোনেটিক্স-এর ছাত্র ছিলাম। আর আমার 'ডিজাইন'-এর শিক্ষক ছিলেন অধ্যাপক শ্রীনিভাসন। তিনি ছিলেন আবার MIT-এর প্রধান একবার আমাদেরকে চার জনের এক একটি দলে ভাগ করা হয়েছিল। আর আমাদের দলের কাজ ছিল, একটা লো-লেভেল অ্যাটাক এয়ারক্রাফটের ডিজাইন তৈরি করা। আমার দলে আমার কাজ ছিল এরোডিনামিক-এর ডিজাইন তৈরি। আমরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে কঠোর পরিশ্রম করে গেলাম। আমার দলের অন্যান্য সদস্যরা কাজ করছিল বাকি জিনিসগুলো নিয়ে। যেমন—প্রপালশন, এয়ারক্রাফট-এর গঠন, কন্ট্রোল, যন্ত্রপাতি এ সব নিয়ে। আমাদের অন্য সকল কোর্সের পড়ালেখা তখন শেষ। তাই আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা গবেষণা এবং ডিজাইন নিয়ে আলোচনা করতাম। আমরা সবাই আমাদের শিক্ষককে আমাদের ডিজাইন দেখিয়ে আকৃষ্ট করতে চাইছিলাম। আমরা ধীরে ধীরে কাজও গুছিয়ে ফেললাম।

কয়েক সপ্তাহ পর অধ্যাপক শ্রীনিভাসন আমাদের ডিজাইন দেখতে চাইল। আমি আমার প্রজেক্ট অর্থাৎ ডিজাইন প্রফেসরকে দেখালাম, তিনি তা সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন। অতি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম একটি।

আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রজেক্ট নিয়ে তার মতামত শোনার অপেক্ষায় রইলাম। আমি এখনও মনে করতে পারি–তিনি যেভাবে ভ্রু কুঁচকে তার সামনে ছড়িয়ে রাখা কাগজগুলো পরীক্ষা করে দেখছিলেন। এরপর তিনি আমার দিকে ফিরে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তার মুখ থেকে বের হওয়া প্রতিটি শব্দ যেন আমাকে আঘাত করল। তিনি বলেছিলেন, 'এই প্রজেক্ট ভালো হয়নি কামাল!' এরপর তিনি আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার বললেন, 'তোমার কাছ থেকে আমি আরো বেশি কিছু আশা করেছিলাম। এটা একটা ছন্নছাড়া কাজ হয়েছে। আমি হতাশ। আমি ভাবতে পারছি না তোমার মতো মেধাবী একজন লোকের কাজ এতটা খারাপ কেন হবে।'

আমি হতবুদ্ধি হয়ে প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমি বরাবরই আমার ক্লাসের সেরা ছাত্রদের একজন। আমার কোনো শিক্ষক তখন পর্যন্ত আমার কোনো ভুল ধরতে পারেনি। কিংবা আমার কোনো কাজে কখন অসন্তুষ্ট হননি। তাই এই লজ্জাজনক অভিজ্ঞতা আমার জন্য নতুন ছিল। আর

আমি কোনোভাবেই এই অভিজ্ঞতাকে মেনে নিতে পারছিলাম না। প্রফেসর মাথা নেড়ে আমাকে বললেন যে, আমাকে আবারও পুরো ডিজাইন নতুন করে তৈরি করতে হবে। আমার ধারণাগুলোকে আবার নতুন করে সাজিয়ে কাজ শুরু করতে হবে। আমিও সম্মতি জানালাম।

এরপর তিনি পরবর্তী দুঃসংবাদটি জানালেন। আমাকে পুরো কাজ নতুন করে তৈরি করতে হবে। এবং মাত্র তিন দিনের মাঝে আমাকে কাজ শেষ করতে হবে। তিনি বললেন, 'আজ শুক্রবার। তোমাকে সোমবার সন্ধ্যার ভেতর কাজ শেষ করতে হবে। সোমবার সন্ধ্যার ভেতর যেন আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাতে পারি। যদি তুমি সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারো, তবে তোমার স্কলারশিপ বন্ধ হয়ে যাবে।

আমি আবারও বোকার মতো তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। একমাত্র স্কলারশিপ-এর মাধ্যমেই আমি MIT-তে পড়তে পারছিলাম। স্কলারশিপ ছাড়া আমার পক্ষে খরচ বহন করা সম্ভব হবে না। আমার পড়ালেখের ইতি ঘটবে।

আমার নিজের আকাঙ্ক্ষা, আমার বাবা-মায়ের স্বপ্ন, আমার বোন এবং জালালউদ্দীনের স্বপ্ন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আমি দেখলাম, সেই স্বপ্নগুলো সব চুরমার হয়ে যেতে চলেছে। আমি ভাবতেই পারছিলাম না যে, আমার প্রফেসরের কয়েকটি শব্দের কারণে আমার কাছে নিজের ভবিষ্যৎ ঝাপসা হয়ে যাবে।

.

এবার আমাকে সবকিছু ঠিকভাবে করতে হবে। নিজেকে প্রমাণ করতে হবে। সেদিন রাতে আমি কিছু খেলাম না। সারারাত ড্রইং বোর্ড-এর সামনে কাটালাম। আগের বার যখন ডিজাইন করছিলাম, তখন ডিজাইনের উপাদানগুলো আমার মাথায় ছাড়া ছাড়া ভাবে এসেছিল। তবে এবার আমার ভাবনাগুলো বেশ গোছানো ছিল। আমি স্বচ্ছন্দে কাজ করতে পারছিলাম। আমার মনযোগের কারণে আমি কাজে এতটাই ডুবে ছিলাম যে, আমার মাথায় আর অন্য কোনো চিন্তা রইল না। আমি এক মনে কাজ করে গেলাম। সকাল হলো। পরদিনও আমি যন্ত্রের মতো কাজ করে গেলাম। আমি কিছু সময়ের বিরতি নিলাম। হাত-মুখ ধুয়ে হালকা খাবার খেয়ে নিলাম। খাওয়া শেষ করে আবারও কাজে ফিরে গেলাম। রবিবার সন্ধ্যা নাগাদ আমি আমার কাজ প্রায় গুছিয়ে এনেছি। আমার এবারের ডিজাইন পরিষ্কার এবং আকর্ষণীয়। আমি আমার ডিজাইন নিয়ে গর্বিত এবং আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। আমি আমার কাজ প্রায় শেষ করে নিয়ে এসেছি। তখন কেবল শেষ মুহূর্তের কিছু কাজ বাকি ছিল। এমন সময় আমি সেই রুমে অন্য কারো উপস্থিতি টের পেলাম। আমার প্রফেসর এসেছেন, আমার কাজের তদারকি করতে। তিনি টেনিস খেলার পোশাক পরিহিত ছিলেন। খেলা শেষ করে ক্লাব থেকে বাড়ি ফেরার পথে এখানে এসেছেন। তিনি ঠিক কতক্ষণ আগে এসেছেন আমি বলতে পারব না। তবে তিনি সেখানে এসে নীরবে দাড়িয়ে ছিলেন এবং আমাকে দেখছিলেন। আমাদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো। তিনি এগিয়ে আসলেন। তিনি আবারও সূক্ষ্মভাবে আমার ডিজাইন পরীক্ষা করে দেখলেন। বেশ সময় নিয়েই দেখলেন। তারপর তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে

আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছিলেন, আমি জানি, আমি প্রথমবার তোমার কাজ বাতিল করে তোমাকে বেশ চাপে ফেলে দিয়েছিলাম। আমি তোমাকে যে সময় দিয়েছিলাম, তার মধ্যে কাজ শেষ করা অসম্ভব ব্যাপার। তারপরও তুমি তোমার কাজ শেষ করতে পেরেছ। আর তোমার ডিজাইন দেখে আমি কেবল একটা শব্দই বলব, 'অসাধারণ'। তোমার শিক্ষক হিসেবে আমার দায়িত্ব হলো, তোমার সুপ্ত প্রতিভাকে বের করে আনা। যাতে করে তুমি নিজের যোগ্যতা এবং ক্ষমতা বুঝতে পারো।'

দুই দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পরে প্রফেসরের শব্দগুলো আমার কানে মধুর সংগীতের মতো লাগছিল। আমি আবারও আমার আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলাম। সেদিন আমি দুটো শিক্ষা পেলাম। প্রথমটি, যে শিক্ষক তার ছাত্র-ছাত্রীদের অগ্রগতি নিয়ে চিন্তিত থাকেন, তার চেয়ে ভালো বন্ধু কেউ হতে পারে না। কারণ তিনি জানেন, কিভাবে তার ছাত্র-ছাত্রির উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। দ্বিতীয়টি হলো, ইম্পসিবল ডেডলাইন' বলতে আসলে কিছুই নেই। আমি অনেক কঠিন অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে কাজ করেছি। এর মধ্যে কোনো কোনোটায় আবার দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতারা আমার কাজের তদারকিতে ছিলেন। তবে প্রফেসর শ্রীনিভাসনের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষার জন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি আমাকে নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে উপলব্ধি করিয়েছেন। আর সেই অভিজ্ঞতা আমার জীবনের পরবর্তী সময়গুলোতেও আমাকে সহায়তা করেছে।

.

MIT-তে পড়ালেখা শেষ করে আমি কর্মজীবনে প্রবেশ করলাম। আমি তখনও জানতাম না, ভবিষ্যৎ আমার জন্য কিছু কঠিন শিক্ষা নিয়ে অপেক্ষা করছিল। আমি ব্যাঙ্গালোরের Hindustan Aeronautics Limited (HAL) কাজ করছিলাম। সেখানে কাজ করতে গিয়ে এয়ারক্রাফট, ডিজাইন এবং প্রযুক্তি সম্পর্কে আমি অনেক কিছু শিখি। আমি ঠিক করেছিলাম যে, আমি এই এয়ারক্রাফটের ক্ষেত্রেই কাজ করব। Hindustan Aeronautics Limited (HAL) থেকে অ্যারোনটিকাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে গ্রাজুয়েশন করার পর আমি দুটো চাকরির প্রস্তাব পেলাম। প্রথমটি ছিল, এয়ার ফোর্সের। আর দ্বিতীয়টি হলো, Directorate of Technical Development and Production (DTD&P[Air]) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে। দু জায়গায়ই সাক্ষাতকারের জন্য আমাকে যেতে বলা হলো। প্রথম চাকরি ছিল দেরাদুনে আর দ্বিতীয়টি দিল্লিতে। আমি অনেক আশা নিয়ে আমার যাত্রা শুরু করলাম।

MIT-তেই আমি প্রথমবারের মতো এয়ারক্রাফট সামনা-সামনি দেখতে পাই। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এয়ারক্রাফটের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং দেখানোর জন্য সেখানে দুটো বাতিল এয়ারক্রাফট রাখা হয়েছে। সেই এয়ারক্রাফট দুটোর প্রতি আমার তীব্র আকর্ষণ ছিল। আমি বারবার সেই এয়ারক্রাফটগুলোর সামনে ছুটে আসতাম। আমি সেই এয়ারক্রাফট দুটোকে দেখতাম ভিন্ন আঙ্গিকে। আমার কাছে এয়ারক্রাফট দুটো ছিল মানুষের যোগ্যতার প্রতীকের মতো। নিজের কল্পনার বাইরে চিন্তা করার যোগ্যতা।

অনেকটা নিজের স্বপ্নে পাখা জুড়ে দেওয়ার মতো। আকাশে উড়তে পারার প্রতি তীব্র আকর্ষণের জন্যই আমি অ্যারোনটিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ালেখা করি। এবং এই আকর্ষণের কারণেই নিয়ে বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম করে যাই। এয়ারক্রাফট চালানোর স্বপ্ন ছিল আমার। বায়ুমণ্ডলের উচু থেকে উঁচু স্তরে আমার এয়ারক্রাফট উঠতে থাকবে আর তার নিয়ন্ত্রণ থাকবে আমার হাতে-এই ছিল আমার স্বপ্ন। আর এই স্বপ্নই আমি লালন করে আসছিলাম। আর এখন আমি পাইলট হওয়ার শেষ ধাপে পৌছে গিয়েছি।

তামিলনাড়ু থেকে দেরাদুন বেশ অনেকটা পথ। কেবল ভৌগলিক দিক দিয়েই নয়, দুরত্বের দিক দিয়েও। আর আমার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমি আমার এই মায়াবী অঞ্চল থেকে হিমালয়ের পাদদেশে যাত্রা করছিলাম। সেখানে অপেক্ষা করছিল আমার পুরষ্কার। আমার পাইলট হবার স্বপ্ন।

.

প্রথমে আমি দিল্লিতে থামলাম। DID&P-এর ইন্টারভিউ এর জন্য। আমি মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম যে এই ইন্টারভিউ কঠিন হবে না। বরং সহজ হবে। আমাকে নিজের জ্ঞানের পরিধির বাইরে চিন্তা করতে হবে না। আমি দিল্লিতে এক সপ্তাহ কাটালাম। তারপর রওনা দিলাম দেরাদুনে। এয়ার ফরস সিলেকশন বোর্ডের ইন্টারভিউয়ের জন্য। বলে রাখা ভালো যে, তখন আমার বয়স বিশের ঘরে। দুনিয়ার সামনে নিজেকে কিভাবে উপস্থাপন করতে হয়, সে বিষয়ে আমার জ্ঞান খুবই সামান্য। যখন আমি প্রথম রামেশ্বরাম থেকে পড়ালেখা করতে বড় শহরে যাই, আমি একজন লাজুক, স্বল্পভাষী বালক ছিলাম। আমার ব্যক্তিত্বের ইতিবাচক দিকগুলো ফুটিয়ে তুলতে আমাকে পরিশ্রম করতে হয়েছিল। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের সাথে যোগাযোগ এবং কথাবার্তার মাধ্যমে আমি এমনটা করতে পেরেছিলাম। এটা মোটেও কোনো সহজ কাজ নয়। এই কাজে সক্ষম হবার জন্য আমাকে বহু হতাশার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। যাই হোক, তখন আমার পড়ালেখাও শেষ। আমিও চাকরির ইন্টারভিউয়ের জন্য যাচ্ছি। আর তখন আমি তামিল এবং ইংরেজি উভয় ভাষাতেই নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে সক্ষম।

এবার আসি এয়ার ফরস ইন্টারভিউ সিলেকশন বোর্ডের কথায়। ইন্টারভিউ বোর্ড থেকে আমাকে যে যে প্রশ্ন করা হলো, আমি তার সবগুলোর উত্তর দিয়ে গেলাম। আমি বুঝতে পারলাম যে, এখানে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বৈষয়িক জ্ঞানের পাশাপাশি স্মার্টনেসে'-র ওপরও জোড় দেওয়া হচ্ছে। প্রার্থীদের শারীরিক ক্ষমতা এবং আত্মপ্রকাশের ক্ষমতাই মূলত তারা খুঁজছিলেন। আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করলাম। এই চাকরি পাওয়া হবে আমার কাছে স্বপ্ন পূরণের মতো। আমি একই সাথে আত্মবিশ্বাসী, উদ্বিগ্ন, সংকল্পবদ্ধ এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। অবশেষে ফলাফল প্রকাশিত হলো। আমি আমার ব্যাচে নবম স্থান অর্জন করি। কিন্তু পদ সংখ্যা মাত্র আটটি। আমার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আমি পাইলট হতে পারলাম না।

আমি এখনও আমার সেই ব্যর্থতার কষ্ট উপলব্ধি করতে পারি। আমি প্রথমে বুঝতেই পারছিলাম না, আমার সাথে এ কি হয়ে গেল! যখন কারো দীর্ঘদিনের কোনো স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, তখন

হতাশা আর শুন্যতা ছাড়া সে আর কিছু অনুভব করতে পারে না। আর স্বপ্নভঙ্গের এ বেদনা খুবই কষ্টকর। ফলাফল দেখার পর আমি আর ঘরের চার দেয়ালের মাঝে থাকতে পারলাম না। আমাকে মুক্ত বাতাসে নিশ্বাস নেয়ার জন্য বাইরে বের হতে হলো। কারণ ঘরে থাকলে আমার মনে হতো, ঘরের দেওয়াল চারিদিক দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

বাইরে বের হয়ে আমি একটি উচু চুড়ার কিনারায় উঠে নিচে তাকালাম। আমি নিচের লেকের টলমলে পানির দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম-এখন আমি কি করব? আমার পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে হবে। আবার নতুন করে সবকিছু নির্ধারণ করতে হবে। আমি সিধান্ত নিলাম আমি কয়েকদিনের জন্য ঋষিকেশ যাব। সেখানে গিয়ে এক নতুন সূচনা নির্ধারণ করব।

.

পরদিন সকালে আমি ঋষিকেশ পৌছালাম। আমি গঙ্গায় স্নান করলাম। এই নদী সম্পর্কে আমি অনেক কিছু শুনেছি। তবে জীবনে প্রথমবারের মতো আমি নিজ চোখে এই নদী দেখলাম এবং স্নান করার অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। আমাকে শিভানন্দ আশ্রমের কথা বলা হয়েছিল। আশ্রমটা একটা পাহাড়ে নির্মাণ করা হয়েছিল। আমি সেখানে গেলাম। হেঁটেই পৌছালাম সেখানে। সেখানে প্রবেশ করা মাত্রই আমি নিজের মধ্যে এক ধরনের অদৃশ্য শক্তির উপস্থিতি পেলাম। এক ধরনের শান্তি আমার বেদনায় ব্যথিত হৃদয়ে জায়গা করে নিল। আশ্রমে সাধুরা ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ছিল। আমি আশা করছিলাম যে তাদের মধ্যে কেউ একজন হয়ত আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে। কেউ একজন আমার সকল দুশ্চিন্তা এবং হতাশার লাঘব করবে।

আমি স্বয়ং স্বামী শিভানন্দের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। আমি মুসলমান এ- নিয়ে তার কোনো সমস্যাই ছিল না। উল্টো তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন যে, আমি কি নিয়ে এতটা হতাশ। আমি অবাক হয়ে গেলাম। অবাক হলাম এই ভেবে যে-আমি তাকে কিছু বলার আগেই তিনি কিভাবে বুঝতে পারলেন যে, সম্প্রতি আমার জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনার কারণে আমি হতাশায় জর্জরিত। তিনি প্রথমে মনোযোগ দিয়ে আমার সব কথা শুনলেন। তারপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। আমি অনুভব করতে পারছিলাম যে, তার সামান্য একটু হাসিতে আমার যত দুশ্চিন্তা আছে তা দূর হয়ে গেছে। এবং সেই স্থান দখল করে নিয়েছে এক গভীর প্রশান্তি। তার পরবর্তী কথাগুলো আমার জীবনে পাওয়া শ্রেষ্ঠ সব উপদেশগুলোর মধ্যে একটি। এখনও তার সেই ব্যক্তিত্বসুলভ ভারি কন্ঠ আমার কানে বেজে ওঠে।

‘নিজের ভাগ্যকে গ্রহণ করো এবং ভাগ্যকে মেনে নিয়েই জীবনে সামনে এগিয়ে যাও। এয়ার ফোর্স পাইলট হওয়া তোমার ভাগ্যে নেই। তুমি যেই অবস্থানে যাবে, তা এখনও তুমি জানো না। তবে তোমার অবস্থান পূর্বনির্ধারিত। এই সাময়িক ব্যর্থতা ভুলে যাও। এই ব্যর্থতা তোমাকে তোমার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য দরকারি ছিল। তোমার জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য খুঁজে বের কর।...নিজেকে সৃষ্টিকর্তার কাছে বিলীন করে দাও।’

এই শিক্ষা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করল। সত্যিই তো, আমরা কেন নিজেদের ভাগ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি? আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, সৃষ্টিকর্তা আমার জন্য যে লক্ষ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন, এই ব্যর্থতা তারই একটি অংশ। আমি এই ব্যর্থতার কথা ভুলে গিয়ে সামনে বাড়লাম। আমি দিল্লিতে ফেরত আসলাম। সেখানে আমি জানতে পারলাম যে, আমাকে DTD&P-এর সিনিয়র সাইন্টিফিক অ্যাসিস্টেন পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আমি আমার পাইলট হওয়ার স্বপ্নের ইতি টানলাম। আমি বুঝতে পারলাম যে, আমার অন্য আরো অনেক কাজ করার আছে। আর আমাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আমি আমার সেরাটা দিয়ে সেই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করব।

এভাবেই আমি আমার কর্মজীবন শুরু করি। আমার মতো যারা একটা নির্ধারিত লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে, তাদেরকেও সেই লক্ষ্য পূরণে অনেক অপ্রত্যাশিত বাধা-বিপত্তির সম্মুখিন হতে হয়। তখন আমাদেরকে পুনরায় আমাদের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। আমাদের পথগুলোকে পুনরায় সাজাতে হবে। প্রতিটি ব্যর্থতাই আমাদেরকে নতুন শিক্ষা দেয় এবং জীবন সম্পর্কে নতুন কিছু জানার সুযোগ করে দেয়। এই পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের ব্যক্তিত্বেরও পরিবর্তন ঘটে। যখন আমরা আমাদের জীবনের বাধা- বিপত্তিগুলোর মুখোমুখি হই, আমরা আমাদের লুকায়িত সাহস এবং সহনশীলতা খুঁজে পাই। আমাদের জানা থাকে না যে, আমাদের মাঝে এতটা সাহস এবং সহনশীলতা আছে। তাই এই ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই আমরা এই অমূল্য গুণাবলিগুলোকে নিজেদের মাঝে আবিষ্কার করতে পারি। আমাদের সেগুলোকেই নিজের পথের পাথেয় করে জীবনে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

আমার প্রিয় বই

মাই জার্নি : স্বপ্নকে বাস্তবতা প্রদান – এ পি জে আবদুল কালাম আমার প্রিয় বই

আমার প্রিয় বই

যখনই কোনো ভারতীয় তরুণের সাথে আমার কথাবার্তা হয়, আমাকে তারা সবাই একটি প্রশ্ন করে থাকে। প্রশ্নটি হলো, আপনার প্রিয় বই কোনগুলো? আধুনিক জীবনযাপনের ধারায় আমাদের অনেক অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটেছে। তবে মানুষের পড়ার অভ্যাস এখনই বহাল আছে। সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন বই থেকে শুরু করে সবকিছুই আমরা হাতের কাছে পেয়ে থাকি। তাই আমাদের পড়ার উৎসের কোনো অভাব নেই। ভারতে শিক্ষার হার বৃদ্ধির পাশাপাশি, বইয়ের চাহিদাও রয়েছে। এই বিষয়টি সত্যিই অসাধারণ। এর মাধ্যমে বোঝা যায় জনগণ স্কুলে কেবল লেখাপড়া শিখছে না।

তাদের মধ্যে জ্ঞান আহরণের স্পৃহা তৈরি হচ্ছে। আমার তাই মনে হয়, তারা একই সাথে শিক্ষিত হচ্ছে এবং নিজেদের চিন্তাভাবনার উন্নতি ঘটাচ্ছে। এতে করে তাদের বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পড়ার অভ্যাস মানুষের মাঝে কিছু অমূল্য গুণাবলির জন্ম দেয়। বই পড়া নিয়ে যত কিছুই বলা হোক না কেন, বলে শেষ করা যাবে না। ব্যক্তিগতভাবে যদি আমি নিজের কথা বলি, তাহলে বলব যে বই বরাবরই আমার পথের পাথেয়। আমার চিরন্তন বন্ধু। ছোটকাল থেকেই আমার বই পড়ার অভ্যাস। আমার শৈশব থেকে পাওয়া বইয়ের সঙ্গ আমি কখনই ভুলে যাইনি। এই আমার এমন এক ধরনের সঙ্গ, যে আমাকে হাতে ধরে জীবনে চলতে শিখিয়েছে এবং কখনও আমার সঙ্গ ত্যাগ করেনি। বইয়ের প্রতিটি শব্দই ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির শিক্ষা দেয়। আর আমি আমার এই বন্ধুকে ব্যবহার করেছি আমার আশেপাশের জগতকে বুঝতে পারার জন্য।

জীবনে বহু বইপ্রেমিদের সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে। তারা সবাই বইয়ের প্রতি আমার ভালোবাসার প্রশংসা জানিয়েছেন। এদের মধ্যে একজন বইপ্রেমির কথা আমার মনে পড়ছে। তার সাথে আমার পরিচয় মাদ্রাজে। ঘটনা বহু আগের। আমি তখন MIT-তে পড়ালেখা করছিলাম। তখন রুশ সাহিত্য সম্পর্কে আমার অধীর আগ্রহ জাগায়। এবং রুশ সাহিত্য নিয়ে সংগ্রহ করা একটা বই পড়ে আমি আমার আগ্রহ মেটাচ্ছিলাম। যাই হোক, সেই সময়টায় আমার বাড়িতে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। তবে আমার পকেট প্রায় সময়ই ফাঁকা থাকত। এমনকি রামেশ্বরামে যাওয়ার জন্য ট্রেনের টিকেটের টাকাটুকুও তখন আমার কাছে ছিল না। আমি দেখলাম, আমার সামনে একটা পথ খোলা আছে। আমি যে বইটি পড়ছিলাম, সেটি বিক্রি করে দিতে হবে। তাহলে এই আর্থিক সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। মাদ্রাজে যেই মার্কেটটিতে এই ধরনের বই কেনাবেচা হয় তা হলো, 'মোর মার্কেট।' এটি একটি বাজার এলাকা যেখানে সব ধরনের পণ্য-সামগ্রি পাওয়া যায়। তবে এই মার্কেটের আমার সবচাইতে পছন্দের জায়গা হলো পেছনের দিকের একটা সংকীর্ণ জায়গা। সেখানে সকল প্রকার 'সেকেন্ড হ্যান্ড' বই কেনাবেচা হয়। সেখানকার একটা দোকানে আমি প্রায়ই যেতাম। কারণ, দোকানের মালিক আমার বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। তার কাছ থেকেই আমি বিভিন্ন বই ও লেখকের কথা জানতে পারি। এবং তার অবদানেই নতুন আসা অসাধারণ সব বই পাঠ করার সুযোগ পাই। তো, আমি তার কাছে গেলাম রুশ সাহিত্য নিয়ে যে বইটি পড়ছিলাম, সেই বইটি বিক্রি করতে। তিনি আমার বই বিক্রির কথা শুনে আমার দিকে করুণা বা দুঃখিভাবে তাকালেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন আমি বইটা বিক্রি করতে চাই না। সাথে সাথে তিনি এই বিষয়টাও উপলব্ধি করতে পারছিলেন যে-বই বিক্রি করা ছাড় আমার আর কোনো পথ নেই। তার মাথায় একটি বুদ্ধি এলো। খুবই সাধারণ বুদ্ধি। তবে সেই বুদ্ধি দ্বারাই আমার সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

তিনি আমাকে বললেন যে, আপনি বইটি আমার কাছে বন্ধক রাখতে পারেন। তিনি বইটি বন্ধক রেখে আমাকে টাকা ধার দেন। আবার যখন আমার কাছে টাকা হবে তখন আমি তার ধার পরিশোধ করে তার কাছে থেকে বইটি নিয়ে যাব। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, তিনি বইটি বিক্রি করবেন না। আচানক আমার ভাগ্যের পরিবর্তনে আমার আনন্দের সীমা রইল না। আমি তখন আমার বাড়িতেও যেতে পেরেছিলাম এবং আমাকে বইও বিক্রি করতে হয়নি।

আমার এই বইপ্রেমি বন্ধু তার প্রতিজ্ঞা ঠিকই রেখেছিলেন। তিনি বইটি বিক্রি করে দেননি। এরপরও বহু বছর বইটি আমার কাছে ছিল। এই বইটি এক ধরনের স্মারক। আমার এই অদ্ভুত বইপ্রেমি বন্ধুকে স্মরণ করিয়ে দেয় এই বইটি।

.

আমি যখন সেন্ট যোসেফ কলেজের শেষবর্ষে অধ্যয়ন করছি, তখন থেকে আমি ইংরেজি ক্ল্যাসিক বইগুলো পড়া শুরু করি। লিউ টলস্টয়, ওয়াল্টার স্কট এবং থমাস হার্ডির সাথে আমার পরিচয় হয় তাদের বইয়ের মাধ্যমে। তাদের লেখা গল্পগুলোর ধরণ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল। সম্পূর্ণ নতুন ধাঁচের গল্প। আর তাদের বইয়ের ভাষা এবং বচনভঙ্গিও আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন ছিল। তবে তাদের লেখনির মাধ্যমে ফুটে ওঠা মানুষের সম্পর্ক এবং সামাজিক জীবন নিয়ে গভীর জীবনদর্শন আমাকে আকৃষ্ট করে।

সাহিত্যের পর আমি স্বনামধন্য কিছু দার্শনিকের বই পড়ি। এরপর পড়ি বিজ্ঞান নিয়ে লেখা বই। বিশেষ করে পদার্থবিজ্ঞান। আলবার্ট আইনস্টাইনের একটা গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। গল্পটা হলো—

আলবার্ট আইনস্টাইনের বয়স তখন বার। তার শিক্ষক ম্যাক্স ট্যালমুড তাকে একটি বই দিলেন। বইটি ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতির ওপর লেখা। এই বইটি পড়েই কিশোর আইনস্টাইনের চিন্তার জগত উন্মোচিত হয়। তিনি এই মহাবিশ্বের নিগূঢ় রহস্য খুঁজে বের করার উৎসাহ পান। এমনকি তিনি মানুষের মস্তিষ্কের ক্ষমতা সম্পর্কেও উপলব্ধি করতে পারেন।

.

আমার জীবনে আমি অসামান্য কিছু বই পড়তে পেরেছি। এ আমার সৌভাগ্য। তবে যদি আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, আমার পছন্দের বই কোনগুলো। আর কোন বইগুলো আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পেরেছে, তবে আমি তিনটি বইয়ের নাম নেব।

প্রথমটি হলো, 'লাইট ফর মেনি ল্যাম্পস'। বইটির সম্পাদনায় ছিলেন লিলিয়েন এটকলার ওয়াটসন। বইটি আমি প্রথম পড়ি ১৯৫৩ সালে। সেই সেকেন্ড হ্যান্ড বইয়ের দোকান থেকে কিনি বইটি। আমি এই বইটিকে নিজের পথচলার সঙ্গি হিসেবে বিবেচনা করি। এই বইটি ঠিক কতবার পড়েছি, তা খেয়াল নেই। 'লাইটস ফ্রম মেনি ল্যাম্পস' বইটি বহু লেখকের লেখার সমন্বয় তৈরি। এই বইতে সব অনুপ্রেরণামূলক গল্প সংকলিত আছে। আমার নিজের জীবনের অনুপ্রেরণার উৎসগুলোর মধ্যে এই বইটি অন্যতম।

সম্পাদক বিভিন্ন লেখকের যত অনুপ্রেরণামূলক গল্প আছে, তা সংকলন করেছেন। এবং বইটিতে খুব সুন্দর করে বর্ণনা করা আছে যে, কীভাবে এই গল্পগুলো লেখা হয়েছে। এবং এর মূলকথা বা শিক্ষণীয় বিষয় কী? এই বইতে যে গল্পগুলো আছে তা আমাকে জীবনের নানা দুঃখ-দুর্দশা অতিক্রম করতে

সাহায্য করছে। যখন আমার উপদেশের দরকার ছিল, আমাকে উপদেশ দিয়েছে। যখন আমার আবেগের কারণে আমি কোনো বিপদের সম্মুখিন হয়েছি, তখন আমার চিন্তা-ভাবনার মধ্যে ভারসাম্য এনেছে বইটি। বইটির অনেক সংস্করণ হয়েছে। আমার এক বন্ধু কিছু বছর আগে নতুন এক সংস্করণ পেয়েছে এবং উপহারস্বরূপ আমাকে দিয়েছে বইটি।

আমার পছন্দের দ্বিতীয় বইটি হলো, 'থিরুকুরাল'। বইটি ২০০০ বছর আগের লেখা। লেখকের নাম থিরুভাল্লুভার। এই বইয়ে ৩৩০টি তামিল কাপলেটস বা কুড়াল রয়েছে। কুড়াল হলো, এক ধরনের নীতিমূলক ছোট কবিতা। এগুলো ছন্দানুযায়ী পড়তে হয়। বইটি তামিলেই রচিত। এই বইতে জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আমার মতে, এই বই তামিল সাহিত্যের এক অনবদ্য সৃষ্টি এবং মূল্যবান সম্পদ। আমার মনে হয়েছে, এই বই আমার জীবনের পথ-প্রদর্শককের কাজ করেছে। কীভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজের ভূমিকা পালন করতে হয়, তা শিখিয়েছে এই বইটি। এই বইটি এমন এক মহৎকর্ম যা মানুষকে ভাবতে বাধ্য করবে। আমার পছন্দের একটি কুড়াল হলো-

"Ulluvathellam uyarvullal matratu
Tallinum tellamai nirttut"

এর অর্থ হলো-

জীবনে ওপরে ওঠার কথা চিন্তা কর, এই ভাবনাই হোক তোমার আকাঙ্ক্ষা, যদি তুমি লক্ষ্যে না পৌছাতে পার, তবে তোমার এই ভাবনাই তোমাকে লক্ষ্যে নিয়ে যাবে।'

পরবর্তী যে বইটির কথা আমি বলতে চাই তা হলো, 'ম্যান দ্য আননোন'। বইটির লেখক একজন নোবেল বিজয়ী। তার নাম অ্যালেক্সিস ক্যারেল। তিনি একাধারে একজন ডাক্তার এবং দার্শনিক। তিনি এই বইতে আলোচনা করেছেন, কীভাবে একই সাথে মানুষের মন এবং শরীরকে সারিয়ে তুলে মানুষকে সুস্থ করে তোলা যায়। তিনি মানব শরীরকে একটি বুদ্ধিমান এবং সমন্বিত সিস্টেম বলে উল্লেখ করেছেন এবং এর অসাধারণ বর্ণনা দিয়েছেন। আমি মনে করি, সবারই তার এই বইটি পড়া উচিত। বিশেষ করে, যারা চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়তে ইচ্ছুক তাদের।

.

বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন উক্তি আমাকে দারুণ প্রভাবিত করেছে। আমি এগুলো পড়ে আমার মনে জমে থাকা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। পবিত্র কুরআন শরীফ, বেদ, গীতা এবং সকল ধর্মীয় গ্রন্থেই গভীর দর্শন বিদ্যমান। এগুলো আমাকে জীবনের বহু সমস্যা থেকে উদ্ধার পেতে সাহায্য করেছে।

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সকল ধর্মীয় উক্তিগুলো কীভাবে সহযোগিতা করে তার একটু বর্ণনা দেই। মূলত আমি কিছু উদাহরণ দিচ্ছি। ব্যাঙ্গালোরে অ্যারোনেটিকাল হিসেবে কিছুদিন কাজ করার

পর আমাকে INCOSPAR-এ রকেট ইঞ্জিনিয়ার পদের সাক্ষাতকারের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই সংস্থার শুরু হয় ড. ভিকরম সারাভাইয়ের হাত ধরে। আমি সাক্ষাতকার নিয়ে ভীষণ চিন্তায় ছিলাম। কী হবে, না হবে তা বুঝতে পারছিলাম না। এমন সময় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, আমার বাবার বন্ধুর পাঠ করা গীতার উক্তিগুলো আমার মনে পড়ল। উক্তিটি হলো-

'প্রতিটি সৃষ্টিই জন্ম থেকেই মোহের প্রতি আকৃষ্ট...
এই মোহ্ ধীরে ধীরে আকাঙ্ক্ষা এবং ঘৃণার দ্বৈততার রূপ নেয়। তবে যে সকল মানুষ মহৎ কাজ করেছে বা করবার ক্ষমতা রাখে, সকল পাপ থেকে মুক্ত তারা—এই মোহ এবং উদ্দুদ্ধতা থেকেও মুক্ত। তাদের মতো করে আমারই উপাসনা কর।'

এই উক্তি আমার সাহস সঞ্চার করল। আমি ভাবলাম, বিজয় লাভের সবচেয়ে উত্তম পন্থা হলো, বিজয় লাভের প্রয়োজন অনুভব না করা। এই দৃষ্টিভঙ্গিই নিয়েই আমি সাক্ষাতকারের জন্য গেলাম।

ভারতের স্পেস প্রোগ্রামের উন্নতি ঘটে এই সংস্থা দ্বারা এবং এই সংস্থায় আমার সেই সকল লোকের সাথে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। যাদের কারণে এই উন্নতি সম্ভব হয়েছে। Indians Space Research Organisation-এর উষালগ্ন থেকে আমি এর সাথে সম্পৃক্ত। সংস্থা যেভাবে বেড়ে উঠেছে এবং দেশের সেবা করেছে, আর যে সকল লোকের কল্যাণে এই সংস্থা বেড়ে উঠেছে ও দিক-নির্দেশনা পেয়েছে, যে সকল লোকের কথা স্মরণ করলে আমার গীতার আরেকটি শ্লোকের কথা মনে পড়ে যায়।

শ্লোকটির মূলকথা হলো-

'ফুলকে দেখ/ একবার ফুলের দিকে তাকাও
নিঃস্বার্থভাবে যে সুগন্ধ ছড়ায় এবং মধু দিয়ে যায়, যখন এর কাজ শেষ হয়-
এ নিঃশব্দে ঝরে যায়।
ফুলের মতো হওয়ার চেষ্টা করো
এর গুণাগুণগুলো নিজের মাঝ বপন করো।'

এই উদ্যোমি সংস্থা হলো ফুলের মতো। এরা নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনা এবং দিক-নির্দেশনা দিয়ে গেছে। এ রকমটা তখন হয়েছিল যখন আমি Defense Research And Development Organization (DRDO)-তে কাজ করছিলাম। আমার কাজ ছিল, ভারতের নিজস্ব মিসাইল তৈরির প্রোগ্রামে। এখানে বহু সাহসিক এবং মেধাবি মানুষ ও নেতাদের সাথে কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাদের কথা স্মরণ হলে আমার কানে পবিত্র কুরআনের বাণী বেজে ওঠে—

'আলোর ওপর আলো। আল্লাহ তার পছন্দের বান্দাদেরকে নিজের
আলোয় আলোকিত করেন এবং দিক-নির্দেশনা দেন।'

আমার ব্যক্তিগত জীবনেও এই সকল ধর্মীয় গ্রন্থ আমাকে সহায়তা করেছে। জীবনের অর্থ উপলব্ধি করতে শিখিয়েছে।

.

আমার বাবা-মা একই বছরে মারা যান। আমি তখন রাশ্বেরামের মসজিদে দুহাত তুলে প্রার্থনা করছিলাম।

মায়ের মৃত্যুর আগে তাকে দেখতে আসতে না পারায় দুঃখে আমার হৃদয় তখন ভারাক্রান্ত। তবে কিছুক্ষণ পরে কুরআনের একটি বাণী মাথায় এলো—আমি এই বাণী দ্বারা বুঝতে পারলাম। এ-মৃত্যুকে কখনও থামানো যায় না। মৃত্যু, যখন যেখানে লেখা আছে, সেভাবেই হবে। কেবল সৃষ্টিকর্তাই অবিনশ্বর। বাণীটির মূলকথা হলো-

'তোমার সহায় সম্পদ এবং সন্তান সন্ততি কেবল সাময়িক সুখমাত্র। কেবল আল্লাহ এবং একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই চিরন্তন।'

.

সাহিত্যের জগতে আমার অন্যতম ভালোবাসা হলো কবিতা। টি এস এলিয়ট, লিউইস ক্যারোল এবং উইলিম বাটলার ইয়েটস-এর কবিতা আমার মনের মাঝে আলোড়ন তোলে। বৈজ্ঞানিক কর্মক্ষেত্রে আমার পদচারণায় লিইউইস-এর কবিতার লাইনগুলো আমার জন্য যথার্থ বলে আমরা মনে হয়।

Let craft, ambition, spite,
Be quenched in Reason's night,
Till weakness turn to might,
Till what is dark be light,
Till what is wrong be right!

যখন প্রচণ্ড কাজের চাপে আমি জর্জরিত থাকতাম। দিন কখন রাত হয়ে যেত তখন আমার খেয়াল থাকত না। তখন স্যামুয়েল টেইলর কলেরিজ-এর কবিতায় আমি নিজের মানসিক আস্থার প্রতিচ্ছবি দেখতে পেতাম।

Day after day, day after day,
We stuck, nor breath, nor motion;
As idle as a painted ship
Upon a painted ocean

প্রায়ই খুবই স্বল্প সময়ের মাঝে কাজ শেষ করার জন্য আমাকে উঠে পড়ে লাগতে হতো। গ্রুপ ক্যাপ্টেন নারায়ণ (আমার একজন সহকর্মী) গাইডেড মিসাইলের কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য অস্থির হয়ে থাকত। তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন, তুমি যা চাও আমাকে বল, আমি এক্ষুণি তোমার সামনে হাজির করছি। কেবল আমার কাছে সময় চাইবে না। আমি তার কথা শুনে হেসেছিলাম এবং টি.এস ইলিয়টের এই লাইনগুলো আবৃত্তি করেছিলাম-

Between the conception
And the creation
Between the emotion
And the response
Falls the Shadow.

আমাকে যেসকল লেখক এবং লেখনি প্রভাবিত করতে পেরেছে, তার সামান্য কিছুর উল্লেখ আছে এখানে। এই কবিতা, গল্প এবং শিল্পকর্ম সবগুলোই আমার কাছে বন্ধুর মতো। আমার পুরনো এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তারা আমার বিপদ, দুঃখ- দুর্দশা এবং মানসিক অবস্থা বুঝতে পারে। কেবল দুঃখ না, আমার পরম আনন্দের মুহূর্তেও আমার পাশে ছিল। বর্তমান উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার যুগে যখন প্রতিটি তথ্য অতি দ্রুত আসে, তখনও তাদের মাঝেও সেই অসাধারণ লেখনিগুলো হারিয়ে যায়নি। আমি একবার বই নিয়েই একটি কবিতা লিখে ফেলি। প্রায়ই আমি তরুণ সমাজকে আমার এ-কবিতা পড়ে শুনাই। এই কবিতায় বইয়ের জন্য আমার অনুভূতি লেখনির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

‘বই বরাবরই আমার প্রিয় বন্ধু
প্রায় পঞ্চাশ বছর হলো
বই আমাকে স্বপ্ন দেখায়
সেই স্বপ্ন আমার লক্ষ্য হয়ে ওঠে’
বই আমাকে যেই সকল লক্ষ্য আত্মবিশ্বাসের সাথে অর্জনের অনুপ্রেরণা দেয়
আমি যখন ব্যর্থ তখন বই আমাকে দিয়েছে সাহস
ভালো বই আমার কাছে ফেরেশতার মতো
আমার হৃদয় ছুঁড়ে গেছে
তাই আমি আমার ছোট বন্ধুদেরও বইয়ের সাথে বন্ধুত্ব করতে বলি
এই বই তোমাদেরও ভালো বন্ধু।

অ্যা ব্রাশ উইথ ফায়ার

অ্যা ব্রাশ উইথ ফায়ার

আগের অধ্যায়গুলোতে আমি আমার ব্যর্থতা এবং হতাশার ঘটনাগুলোর কথা উল্লেখ করেছি। প্রতিটি ব্যর্থতা বা হতাশার সাথে সাথে জীবন আমাকে নতুন একটি শিক্ষা উপহার দিয়ে গেছে। এখন আমি বুঝতে পারি প্রতিটি হতাশা কেটে যাওয়ার পর মানুষ একটি ভিন্ন আঙ্গিক লাভ করে। লব্ধ অভিজ্ঞতাকে ভিন্ন আঙ্গিকে দিতে চিন্তা করে এবং আমাদের চিন্তা-চেতনায়ও পরিবর্তন আসে। একই সাথে আমাদের আত্মাও প্রভাবিত হয়। আমার তাই বিশ্বাস। আমার আরও বিশ্বাস, আমরা প্রতিটি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলোর মোকাবিলা করতে পারি। যখন আবারও আমরা এই ধরনের অভিজ্ঞতার সামনে পড়ব তখন আমাদের উচিত পালিয়ে না গিয়ে তার মুখোমুখি হওয়া। বিগত অভিজ্ঞতা থেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা যে, এর আগে কীভাবে এর সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছিল। আর কোথায় ভুল হয়েছিল। এর সাথে আরেকটি প্রশ্নের সমাধান জরুরি, প্রশ্নটি হলো-সমস্যাটা কি নিজ থেকেই আমাদের ওপর এসেছিল? নাকি আমরা নিজেরাই ইচ্ছা করে বা নিজেদের ভুলে সমস্যায় জড়িয়ে ছিলাম? এই কথা বলার প্রয়োজন রাখে না যে, প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো বিশেষ ঘটনাই আমাদের মাঝে বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটায়।

বিশেষ করে যখন আমরা আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারি না। উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলো আমাদের কাছে অতীব মূল্যবান অথবা এমন কিছু সাথে জড়িত হতে পারি না যার প্রভাব সার্বজনীন বা জীবন অথবা মৃত্যুর পরিস্থিতি। সাধারণত এই সকল পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেই আমাদের মাঝে গভীর পরিবর্তন সাধিত হয়।

আমার কর্মজীবন থেকে আমি এরকম কিছু পরিস্থিতির কথা স্মরণ করতে পারি। যখন আমি SLV (Satellite launch vehicle) এবং অগ্নি (ভারতের নিজস্ব তৈরি প্রথম মিসাইল) তৈরির প্রজেক্টের নেতৃত্ব দিলাম। তখন আমি এবং আমার দলের সবাইকে নিয়ে ভারত সরকার এবং জনগণের প্রত্যাশা ছিল আকাশচুম্বি। আমাদের কাজের মিডিয়া কভারেজ (প্রচার)। যদিও বর্তমান সময়ের তুলনায় কিছুই না, ছিল তীব্র।

SLV-3 প্রজেক্ট এবং অগ্নি উভয়ই প্রথমবার ব্যর্থ হয়। অনেক ধরনের সমস্যার পাশাপাশি প্রাথমিক নিক্ষেপণের অসুবিধাও ছিল। এই অসুবিধার কারণে আমি এবং আমার দলের ওপর বিরাট চাপ ছিল এবং বিপর্যয়ের সম্ভাবনাও ছিল অনেক বেশি। প্রথমবারের চেষ্টায় ব্যর্থ হওয়ায় আমাদের প্রাক্তন অনেক সাফল্যের কথাও তেমন পাত্তা দেওয়া হলো না। তখন আমরা আবার পুনরায় অনুসন্ধান শুরু করলাম এবং ব্যর্থ হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ শুরু করলাম। সেই দিনগুলোর কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে। মোটকথা, আমার স্মৃতিতে গাঁথা থাকবে।

তবে তার প্রভাব থাকবে তাদের কথা ভেবে। যাদের সাথে আমরা কাজ করেছি এবং আমাদের ধারণা এবং ডিজাইন সরবরাহের জন্য যাদের ওপর নির্ভর করেছি। তাদের নিষ্ঠা এবং ভোগান্তি। আমি আমার কর্মজীবনে বহুবার এমন ধরনের অনুভূতি পেয়েছি। এবং প্রত্যেকটিরই এই অনুভূতি আমার হৃদয় স্পর্শ করে গেছে।

.

১৯৬০ এবং ৭০-এর দশকে আমি কাজ করছিলাম Thumba Equatorial Rocket Launching Station (TERLS) -এ। প্রজেক্টের নেতৃত্বে ছিলেন ভিকরম সারাভাই। আমরা নিজেরাই নিজেদের রকেট এসএলভি এবং স্যাটেলাইট তৈরি করছিলাম। একই সাথে আমার দেশের বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে রকেটের জন্য পেলোড তৈরি করে বেরাচ্ছিলাম। রকেটের পরিপূর্ণ গঠন প্রক্রিয়ার এই পেলোডগুলো খুবই প্রয়োজনীয় বস্তু। এই পেলোড প্রস্তুত ল্যাবরেটরিতে আমার এক সহকর্মী কাজ করছিল। তার নাম সুধাকর। একবার আমরা একটি প্রি-লঞ্চ শিডিউলে কাজ করছিলাম। আমরা বিপজ্জনক এক মিশ্রণ সোডিয়াম এবং থারমাইন্ট-এর মিশ্রন নিয়ে কাজ করছিলাম। এবার একটু আমাদের ল্যাবরেটরি এবং আশেপাশের এলাকার বিবরণ দিয়ে রাখি। থুম্বা পূর্ব উপকূলে অবস্থিত। এখানকার আবহাওয়া বরাবরের মতোই উষ্ণ এবং স্যাতস্যাতে। সেদিনও তার ব্যতিক্রম ছিল না। সুধাকর এবং আমি অনেকক্ষণ যাবত কাজ করেছি। চারদিকে অসহনীয় গরম। তবে আমাদের আবহওয়ার দিকে একটুও খেয়াল ছিল না। এই ধরনের ছয়টি মিশ্রণ পূর্ণ করার পর আমরা একবার পেলোড রুমে গিয়ে কাজের তদারক করে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম, পেলোডে এই ছয়টি মিশ্রন যথাযথভাবে ভরা হয়েছে কি না। কাজে নিমগ্ন থাকার কারণে আমরা একটা মৌলিক বৈজ্ঞানিক বিষয় খেয়াল করিনি। সেটি হলো, মৌলিক সোডিয়ামের সাথে পানির সংস্পর্শ ঘটলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আমি আর সুধাকর ঝুঁকে বসে মিশ্রণগুলো পরীক্ষা করছিলাম, এমন সময় সুধাকরের কপাল বেয়ে এক ফোটা ঘাম মিশ্রণে পড়ল। আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিস্ফোরণের ধাক্কায় ছিটকে পড়লাম। রুম-এ শক ওয়েভও ভীষণভাবে নড়ে উঠেছিল। কয়েক সেকেন্ডের জন্য আমি একদম জমে গিয়েছিলাম। আর সেই কয়েক সেকেন্ডেই বিস্ফোরণ থেকে আগুন ‘ লেগে গেল। আমাদের ভীতসন্ত্রস্ত চোখের সামনেই পুরো ল্যাবরেটরিতে আগুন ছড়িয়ে পড়ল। এই আগুন লেগেছে সোডিয়ামের কারণে। তাই পানি ব্যবহার করে এ-আগুন নেভানো যাবে না। উল্টো পানি দিলে আগুন আরও ভয়ানক রূপ নেবে। ল্যাবরেটরি আমাদের চোখের সামনেই নরক আগুনে জ্বলছিল-পরে যখন আমি এই ঘটনা নিয়ে চিন্তা করেছি, প্রতিটি ঘটনা-দুর্ঘটনা, বিস্ফোরণ, আগুন লাগার কারণ বুঝতে পেরেছি। তবে বাস্তবে এই সবগুলো ঘটনা ঘটেছিল মাত্র কয়েক সেকেন্ডে।

আমি কোনোমতে উঠে দাঁড়ালাম। তবে সুধাকর তার উপস্থিত বুদ্ধির প্রমাণ দেখাল। সে পেলোড রুমের জানালা ভেঙে ফেলল। খালি হাতেই সে এ-কাজ করেছিল। এরপর সে এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে প্রথমে আমাকে জানালার বাইরে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে গেল। এরপর সে নিজে লাফিয়ে এলো। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে এ-কাজ করে ফেলল। তবে তীব্র বিস্ফোরণ এবং আগুনের প্রচণ্ড তাপে সুধাকরের প্রথমে বাচার উপায় চিন্তা করতে এবং পরবর্তীতে আমাকে বাঁচিয়ে নিজে বের হয়ে আসতে গিয়ে গুরুতর আহত হলো। আগুনের তাপে তার শরীরের বিভিন্ন জায়গা পুড়ে গিয়েছিল।

এবং খালি হাতে কাঁচ ভাঙতে গিয়ে তার হাত থেকে আমার রক্ত পড়ছিল। এরপর আমরা কোনোমতে টেনে- হিঁচড়ে আগুনের লেলিহান শিখা থেকে দূরে সরে গেলাম। আমার জীবন বাঁচানোর জন্য সুধাকরকে ধন্যবাদ জানালাম। তীব্র ব্যথা স্বত্বেও সুধাকর আমার দিকে তাকিয়ে হাসল এবং আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করল। জখম সারিয়ে উঠতে সুধাকরকে বহুদিন হাসপাতালে কাটাতে হয়েছিল। এই দুর্ঘটনা কেবল আমার জীবনের ভয়ানক দুর্ঘটনার মধ্যে একটি নয়, এই দুর্ঘটনায় একই সাথে একজন টিকে থাকা মানুষের অনুভূতি পাওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করলাম আমি। জেনে-শুনে কেউ একজন নিজের জীবন বিপন্ন করে আমার জীবন রক্ষা করল। আমার জীবনের সবচাইতে সম্মানজনক মুহূর্তগুলোর একটি ছিল এটি। যে সকল মানুষকে প্রাত্যহিক জীবনের চরম দুর্ঘটনাগুলোতে টিকে যায় এবং তাদের রক্ষা করা হয়, তাদের মাঝে এক ধরনের মিশ্র অনুভূতির জন্ম নেয়। এই অনুভূতির মাঝে মিশে থাকে স্বস্তি, আত্মগ্লানি এবং সম্মান। আমার ক্ষেত্রে এই একই অনুভূতি "হয়েছিল। আমার মাঝে একই সাথে তীব্র দায়িত্ববোধই জেগে উঠল I যদি সুধাকর মনে করে থাকে আমার জীবন রক্ষা করা তার জীবনের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ, তবে আমার কর্তব্য হলো, আমরা যে-কাজ করছিলাম তা যেন কোনো কারণেই না পিছিয়ে সঠিক সময়ে সম্পন্ন হয়।

সুধাকরের এই নির্ভীক পদক্ষেপ আমার জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করল। যখন জীবনে নিজেকে আমার ক্ষুদ্র মনে হয়, আমি অনুপ্রেরণা হারিয়ে ফেলি এবং শত-কোটি মানুষের মধ্যে নিজেকে অতি-নগণ্য এবং এই মহাবিশ্বের অতি তুচ্ছ একটি বিন্দু মনে হয়, তখন আমি এই অসাধারণ মানুষটির কথা স্মরণ করি। সুধাকরও বাকি সকল বিজ্ঞানীদের মধ্যে একজন, যে নিজের কাজ করে গেছে, তারপর সে নিজের ভয়কে কাটিয়ে উঠে মহৎ এক কাজ করেছে। অনেক জীবন রক্ষা করা এমন একটি মহৎ কাজ যার মহত্ব ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না।

এরকম আরেকটি ঘটনা আছে, যা আমার হৃদয়ে ক্ষত সৃষ্টি করে গেঁথে আছে। যখন আমি এই দুর্ঘটনার কথা চিন্তা করি, তখন আমার মন ব্যথা এবং গ্লানিতে ভরে ওঠে। একটা হলো ১৯৯৯-এ Arakkonam accident. এই দুর্ঘটনা আমাকে ব্যথায় ভারাক্রান্ত করে তোলে। এই দুর্ঘটনা ঘটার পর আমি এর গুরুত্ব ঠিকই উপলব্ধি করতে পারি। তবে আমি আমার সকল অনুভূতি তখন রাজ্যের বোঝায় চাপা দিয়ে রাখি। এর কয়েক বছর পর আমি আর আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু মিলে একটি বই লিখছিলাম। তখন সেই দুর্ঘটনার কথা মনে পড়ায় আমার মন দুঃখ এবং অনুশোচনায় ভরে ওঠে।

ঘটনা ঘটে ১৯৯৯ সালের ১১ জানুয়ারি। দুটো এয়ারক্রাফট ব্যাঙ্গালোর – থেকে চেন্নাইয়ের আরাক্কোনাম যাচ্ছিল। দুটো এয়ারক্রাফটই Airborne Surveillance Platform (ASP)-এর সাইন্টেফিক মিশনে যাচ্ছিল। তারই একটি এয়ারক্রাফটের নাম ছিল অভ্র। এর সারভেইলেন্স সিস্টেম ছিল Motodome (এক ধরনের ডিমের মতো আকৃতি এর গঠনের সাথে যুক্ত ছিল)। এটা মাটির ১০০০০ ফুট উপর দিয়ে যাচ্ছিল এবং চেন্নাইয়ের বোস্টলাইনের দিকে এর কোস্টলাইন নির্ধারণ করে। সেই কোস্টলাইনের কোনো একটি জায়গায়ই রাডার টেস্টিং গবেষণা চলছিল। অভ্র যাত্রা করার পনের মিনিট আগে একটি A.N-32 এয়ারক্রাফট যাত্রা করে। AW-32 এয়ারক্রাফটটি ছিল রাডার টেস্টিংয়ের টার্গেট এয়ারক্রাফট। এই এয়ারক্রাফট ব্যাঙ্গালোর থেকেই যাত্রা শুরু করে। প্রায় এক-দেড় ঘন্টা যাবত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলল। আর রাডারের সিস্টেমের কার্যকারিতা পর্যক্ষেণ করে

সবাই অনেক খুশি ছিল। বিকেল ৫টার দিকে AN-32 আরাক্কোনামে অবতরণ করে। আর অভ্রও এরকম সময়ই আরাক্কোনামে অবতরণে কোস্ট সেট করেছিল। প্রথমে অভ্র ১০০০০ থেকে ৫০০০ ফুটে নেমে আসল। সবকিছুই ঠিকঠাক। কিন্তু অভ্র যখন এয়ারফিল্ড ৫ নটিক্যাল মাইল দূরে ছিল এবং ৩০০০-৫০০০ ফুটে অবস্থান করছিল তখন এর মটোডোম পড়ে গেল। আর হঠাৎ ভারসাম্যহীন ঘটায় এয়ারক্রাফট অস্থিতিশীল হয়ে তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হলো। এয়ারক্রাফটে মোট ৮ জন লোক ছিল। তাদের প্রত্যেকেই মারা যায়। আমি তখন দক্ষিণ ব্লকে Defense Research Council-এর সাথে মিটিং-এ ছিলাম। এমন সময় আমার কাছে দুঃসংবাদ পৌছাল। আমি মাঝপথেই মিটিং থেকে উঠে ব্যাঙ্গালোরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

এয়ার চিফ মার্শাল এ. ওয়াই টিপনিসও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হৃদয়বিদারক একটি দিন কাটল। আমি যাত্রীদের পরিবার পরিজনের ও তাদের যুবতি স্ত্রী এবং বাচ্চাদের সাথে দেখা করেছিলাম। তাদেরকে আমার কী জবাব দেয়ার ছিল? তাদের ভালোবাসার স্বামীরা defence preparedness-এর কারণে মারা গেছে-এই কী বলতাম? মানুষের দুঃস্বপ্ন যখন বাস্তবে রূপ নেয় তখন কী এরকম কোনো সান্ত্বনা দেয়া যায়? এক যুবতি মা তার বাচ্চাকে দেখিয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন—এই বাচ্চাটির দেখাশুনা এখন কে করবে? আমি তার প্রশ্নে নির্বাক হয়ে রইলাম। আমার বলার মতো কোনো ভাষা ছিল না। আরেকজন মা আমাকে আরেকটি প্রশ্ন করেছিলেন। সেই প্রশ্ন এখনও আমাকে দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করে বেড়ায়। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি আমাদের সাথে কেন এমন করলেন?

সেই প্লেন ক্র্যাশ এতটাই মারাত্মক ছিল যে, আমরা সেই ৮ জনের কোনো চিহ্নও খুঁজে পেলাম না। আমরা কেবল তাদের পরিবারকে সান্ত্বনা দানের জন্য কিছু কফিন জোগাড় করলাম।

সেই কফিনগুলো এয়ারফোর্স হলে রাখা হলো। আমি কোনোমতে একটি বক্তৃতা দিতে পারলাম; ‘এ-বিদায় এই ৮ জন দুঃসাহসিক সৈন্যদের, যারা নিজেদের কাজের মাঝেই চিরতরে বিদায় নিল। আর ফিরে এলো না।’

আমি দুঃখ-দুর্দশা এবং আত্মগ্লানিতে ভারাক্রান্ত হয়ে রাতে আমার রুমে ফিরে আসি। আমি আমার ডায়রিতে লিখলাম-

‘আলোর উৎস ভিন্ন
তবে প্রতিটি আলোই এক
দুনিয়াকে এনে দিলে আনন্দের রেশ
তবে তুমি রয়ে গেলে নিঃশেষ।’

.

এই ঘটনার পরও বছর স্বাভাবিকভাবেই কেটে গেল। আমিও সাউথ ব্লক থেকে রাষ্ট্রপতি ভবনের দায়িত্ব নিলাম। তবে সেখানে গিয়েও আমার মাঝে সেই বিধবাদের কান্না, পিতা-মাতার আকুল নয়ন এবং সন্তানদের আহাজারি রয়ে গেল। যখনই আমি ভাবি যে, তাদের পরিবার পরিজনরা শেষবারের মতোও তাদের দেখতে পেল না! কেবল প্রতিকী কফিন দিয়েই তাদের অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। তখন আর আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারি না।

যখন সাইন্টিফিক এবং ডিফেন্স টেকনোলজি নিয়ে বড় কোনো পরিকল্পনা করা হয়, তখন কী ক্ষমতাধীন লোকেরা একবারও ভেবে দেখেন যে, এর জন্য ল্যাবরেটরি এবং ফিল্ডে কর্মরত বহুলোককে আত্মোৎসর্গ করতে হবে?

কেবল রাজনীতি দিয়েই একটি জাতি তৈরি হয় না। একটি জাতি তৈরি হয় হাজারো লোকের উৎসর্গের মধ্য দিয়ে। তাদের মেধা দ্বারা। এভাবেই তৈরি হয় একটি জাতি।

যখন আমরা অন্যদের ওপর কর্তৃত্বের ক্ষমতা অর্জন করি, তখন আমরা মনে করি যে, আমরা সাফল্যের চূড়ান্ত শিখায় পৌছে গেছি। তবে তখন আমাদের পেছনে ফিরে তাকানো উচিত এবং দেখা উচিত যে, আমরা কাদের উৎসর্গ এবং অবদানের কারণে নিজেদের দৃঢ় অবস্থান তৈরি করতে পেরেছি। যখন আমি আমার বন্ধু, অরুণ তিওয়ারির সাথে এই ঘটনা নিয়ে কথা বলেছিলাম, সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, এই ঘটনা দিয়ে কী বলতে চাও? আমার উত্তর ছিল, ভালো হওয়ার ভান করার দরকার নেই। সৎ হতে চেষ্টা করো। সেবা করার নিগূঢ় ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করো।

আমরা রাজনীতির বহির্মুখীরূপে আটকে আছি। আর এই রাজনীতিই দেশ গড়ছে ভেবে ভুল করে বসে আছি। যে সকল উৎসর্গ, মেধা এবং নিষ্ঠা চোখে পড়ছে মূলত তারা গড়ে তুলছে এই দেশকে

এখনও আমি সেই ঘটনাগুলোর কথা চিন্তা করি। কেবল তাৎক্ষণিক ঘটনাটুকুই নয়। এরপরে যা ঘটেছে, সবসহ। সুধাকরকে হাসপাতালে নেয়া, সেই ৮ জনের দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্থ পরিবারের মুখের কথা। তারা সরকারের কাছ থেকেও সাহায্য পেয়েছিল। এই ঘটনাগুলো ভাবার এক পর্যায়ে আমার মধ্যে এক ধরনের একাকিত্ব জায়গা করে নেয়। যখন আপনি কষ্টের মাঝে থাকবেন যখন আপনার নিজেকে একামনে হবে, তখনই আপনি নিজের প্রকৃত স্বত্বাকে চিনতে পারবেন। আমি আমাকে খুঁজে পেয়েছি এক বড় চেতনার মাঝে। সেই চেতনার মাঝে, যে চেতনা, প্রকৃতি এবং টিকে থাকা নিয়ে প্রশ্নগুলোর সমাধানের পথে নতুন জ্ঞানের জন্ম দেয়।

আমাদের সবাইকেই বহুবার হৃদয় ভাঙার অনুভূতির মধ্য দিয়ে পার হতে হয়। আমরা সবাই একদিন মৃত্যুর মুখোমুখি হব। তবে আমার জীবনের দীর্ঘ আট যুগে আমি যা শিখেছি তা হলো-এই মুহূর্তগুলোই আমাদের সত্যিকারের বন্ধু।

আমরা সবাই কেবল সুখ খুঁজে বেড়াই। তবে সত্যিকারের সুখ আসে তীব্র কষ্টের মধ্যে দিয়ে। যখন আমরা আয়নার মুখোমুখি হই এবং নিজের প্রকৃত রূপ দেখতে পাই, তখন আসে সত্যিকারের সুখ।

আমার শিক্ষক–ড. ভিকরম সারাভাই

আমার শিক্ষক–ড. ভিকরম সারাভাই

আমাদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষকদের আবির্ভাব ঘটে। শৈশবকালে আমি আর মা-বাবাকেই শিক্ষক হিসেবে বিবেচনা করতাম। এরপর আমার জীবনে এলো আমার বন্ধু এবং ভগ্নিপতি আহমেদ জালালউদ্দীন। তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমার জীবনে আসেন। তখন আমি শৈশব ছেড়ে প্রাপ্তবয়সে পরিণত হচ্ছিলাম। ঘটনার পরিক্রমায় আমার কর্মজীবন শুরু হলো। আর আমি সত্যিই ভাগ্যবান যে, আমার কর্মজীবনের শুরুর পর্যায়ে আমি ড. ভিকরম সারাভাইয়ের সান্নিধ্য পেয়েছি। তিনি একাধারে বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, প্রতিষ্ঠাতা এবং পথপ্রদর্শক। তিনি আধুনিক ভারতের একজন অন্যতম চিন্তাবিদ এবং কর্মী। তার মাঝে সূক্ষ্ম-জ্ঞান থেকে শুরু করে একজন নেতার সকল গুণাবলিই বিদ্যমান। গোটা ভারতবর্ষ তার কাছে কৃতজ্ঞ যে, তাকে স্বাধীনতার পর স্পেস প্রোগ্রামের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

তার সম্পর্কে বহু কিছু লেখা হয়েছে। তিনি ISRO প্রতিষ্ঠা করে ভারতের স্পেস মিশনের পরিধি বর্ধন করেন। তিনি পারমাণবিক শক্তি কমিশন-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। একাধিক প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই আহমেদাবাদে Indian Institute of Management (IIM)-এর স্থাপন করেন। আমি তাকে দেখি একজন কিংবদন্তির রূপে। তিনি আমার মতো একজন রকেট ইঞ্জিনিয়ারের কাছে কেবল একজন বীরের মতো ব্যক্তিই ছিলেন না, বরং তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু ছিলেন।

আমার সাথে তার প্রথম পরিচয় হয় যখন আমাকে INCOSPAR-এ রকেট ইঞ্জিনিয়ার পদের জন্য সাক্ষাতকারের আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই আমন্ত্রণ আমার কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। এই আমন্ত্রণ আসে প্রফেসর এম. জি. কে মেনন, Tata Institute of Fundamental Research (TIFR)-এর অধ্যাপক যখন আমাকে নন্দি হোভারক্রাফট-এর কাজ করতে দেখেন তারপর।

সাক্ষাতকারে আমাকে কী জিজ্ঞাসা করা হবে আর কে সেই সাক্ষাতকার নেবেন, তা সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। আমি এও জানতাম না যে, আমাকে কীভাবে পরীক্ষা করা হবে এবং আমার জ্ঞানের ঠিক কোন বিষয়গুলো এখানে কাজে লাগবে। আমি কোনো কিছু প্রত্যাশা না করেই

সে সাক্ষাতকার দিতে গেলাম। আমি ইতোমধ্যে জীবন থেকে শিক্ষা পেয়েছি যে-বিজয়ের মূলমন্ত্র হলো, বিজয় নিয়ে চিন্তা না করে বরং নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া।

আমরা সাক্ষাতকার নিয়েছিলেন ড. সারাভাই, প্রফেসর মেনন এবং মি. সারাফ। মি. সারাফ অটোমেটিক এনার্জি কমিশন-এর সহকারী সচিব। এই তিনজন ব্যক্তির প্রত্যেকেই বিজ্ঞানের জ্ঞানভাণ্ডার। তারপর তারা অমাকে যে উষ্ণতা উপহার দিয়েছিলেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এই সাক্ষাতকারের মধ্য দিয়েই আমার সাথে ড. ভিকরম সারাভাইয়ের ব্যক্তিগত সম্পর্কের শুভ সূচনা হয়।

সাক্ষাতকারে তিনি আমার চিন্তা-প্রক্রিয়া নিয়ে বেশি পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি কেবল আমার জ্ঞানের মাত্রা খতিয়ে দেখেননি, একই সাথে আমি কেমন মানুষ, আমার জীবনের লক্ষ্য কী এবং পেশাদার মানুষ হিসেবে আমার সম্ভাবনা কতটুকু—সবকিছু খতিয়ে দেখছিলেন। তিনি আমাকে অনুপ্রেরণা দিচ্ছিলেন। তিনি খুবই মনোযোগ সহকারে আমার কথা শুনছিলেন। আমি তখনই বুঝতে পারছিলাম, তিনি কেবল একজন ইঞ্জিনিয়ার খুঁজছিলেন না, তিনি এমন একজনকে খুঁজছিলেন, যার ভবিষ্যত সম্ভাবনা আছে। যার মাঝে তিনি নির্দিধায় তার সময় এবং দেশের মহান স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় করতে পারবেন।

.

আমার পেশাদার জীবনে আমি প্রথমবারের মতো তার পর্যায়ের কোনো ব্যক্তির সাথে পরিচিত হয়েছিলাম। যিনি দেশের স্পেস প্রোগ্রাম নিয়ে নিজের বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আমার চিন্তাগুলোও জুড়ে দেবেন। আমি INCOSPAR-এ যোগ দিলাম। এখানে কাজ করতে পারা আমার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হওয়ার মতো ব্যাপার। আমার পেশাদার জীবনেও গুরুত্বপূর্ণ একটি মোড় নিল। আমি আমার দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার পর দেখলাম, এই প্রতিষ্ঠান এবং এর কর্মীরা কীভাবে কাজ করে। আমি অবাক হলাম, আমার প্রাক্তন কর্মক্ষেত্র আর এই প্রতিষ্ঠানের কাজ কতটা ভিন্ন।

কাজের পরিবেশ খুবই ভালো এবং পদ বা জবাবদিহিতা এখানে অতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এর কিছুদিন পরই আমি জানতে পারলাম কীভাবে সারাভাই থুম্বা ইন্টান্যাশনাল রকেট লঞ্চিং স্টেশন প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমি এই গল্প বলতে কখনই ক্লান্ত হই না। আমার কাছে এই গল্প হলো বিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়। যে দুটোর মধ্য দিয়ে আমার জীবন চলে আসছে।

ঘটনা ১৯৬২ সালের। ড. ভিকরম সারাভাই একটি স্পেস রিসার্চ স্টেশন প্রতিষ্ঠার জন্য জায়গা খুঁজছিলেন। তিনি বেশ কিছু জায়গা পরিদর্শন করলেন। দক্ষিণ ভারতের কেরালার থুম্বাকে রিসার্চ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচন করা হলো। কারণ এই জায়গা গবেষণা চালানোর জন্য সবচাইতে উপযোগি। সুবিধাজনক পরিবেশের পাশাপাশি আরেকটা দিকও মাথায় রাখা হয়েছে। যখন ড. সারাভাই এই এলাকা পরিদর্শন করেন, তখন এখানে মাত্র কয়েকটি গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে হাজার খানেক জেলের বাস। এই অঞ্চলে একটি প্রাচীন চার্চও ছিল। St Mary Magdalene Church।

আর চার্চের কাছেই বিশপের বাড়ি। ড. ভিকরম সারাভাই বহু রাজনীতিবিদ এবং আমলাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে এখানে রিসার্চ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি পান। সবশেষে তাকে বিশপের সাথে দেখা করতে বলা হলো। বিশপের নাম ফাদার এ. পিটার বার্নার্ড পেরেইরা। এক রবিবার দিনে ড. সারাভাই বিশপের সাথে দেখা করলেন। ড. সারাভাই আগের দিন অর্থাৎ শনিবারেই বিশপের কাছে গিয়েছিলেন। তবে বিশপ তাকে দেখে হাসলেন এবং পরবর্তী দিন দেখা করতে বলেছিলেন।

রবিবার চার্চের কার্যক্রম শেষ করে ফাদার তার ধর্মসভায় বলেছিলেন, 'মাই চিল্ড্রেন, আমার সাথে একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী আছেন। তিনি এই চার্চ এবং আমার থাকার জায়গাটাকে চাচ্ছেন। একটি স্পেস সাইন্স রিসার্চ ইনস্টিটিউট- এর জন্য। ডিয়ার চিল্ড্রেন, বিজ্ঞান সত্যকে খুঁজে বের করে বুদ্ধির মাধ্যমে। একদিক দিয়ে বিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতা উভয়ই কল্যাণের জন্য কাজ করে। মাই চিল্ড্রেন, আমরা কী ঈশ্বরের এই বাসস্থানটা সাইন্টিফিক মিশনের জন্য উৎসর্গ করতে পারি?'

সেই ধর্মসভার সবাই একত্রে উত্তর দিয়েছিল-'আমেন।'

এভাবেই এ. পিটার বার্নার্ড পেরেইরা ভারতের জাতীয় লক্ষ্য-ISRO প্রতিষ্ঠার জন্য চার্চের বিল্ডিংটি প্রদান করার মহৎ সিদ্ধান্ত নেন। আর এই চার্চ বিল্ডিংই ছিল আমাদের ডিজাইন সেন্টার। এখানেই আমরা রকেট অ্যাসেম্বলি করি এবং ফিলমেন্ট উইন্ডিং মেশিনের ডিজাইন তৈরি করি। আর বিশপের বাড়িটি ছিল আমাদের বিজ্ঞানীদের থাকার জায়গা। গভীর ভালোবাসা এবং যত্ন সহকারে চার্চ বিল্ডিংটার যত্ন নেয়া হয়। আর এই চার্চ বিল্ডিং একই সাথে আমাদের রিসার্চ প্রোগ্রামের যাত্রার চিহ্ন বহন করে। বর্তমানে এই বিল্ডিংটাকেই ইন্ডিয়ান স্পেস জাদুঘর বানানো হয়েছে। পরবর্তীতে TERLS-এর মাধ্যমে Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC) এবং দেশব্যাপী আরবান স্পেস সেন্টার স্থাপন করা হয়।

যখন আমি এই ঘটনা মনে করি, তখন আমি পরিষ্কার দেখতে পাই, ধর্মীয় এবং বৈজ্ঞানিক নেতারা ঐক্যবদ্ধভাবে আরো বড় লক্ষ্য অর্জনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। পরবর্তীতে খুবই কম সময়ের মধ্যে এই এলাকায় একটি নতুন স্কুল এবং চার্চ তৈরি করে দেয়া হয়।

TERLS এবং VSSC-এর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারত বিশ্বমানের রকেট সিস্টেমের ডিজাইন এবং তৈরির সক্ষমতা অর্জন করেছে।

ভারত geo-synchronous, sun synchronous এবং meteorology spacecraft, তৈরি এবং নিক্ষেপণের সক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছে। এর মাধ্যমে দ্রুত যোগাযোগ, আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং পানির নতুন উৎস খোঁজা খুবই সহজ হয়ে গেছে।

ড. সারাভাই এবং পিটার বার্নার্ড কেউই আর আমাদের মাঝে নেই। তবে আমি তাদেরকে দেখতে পাই যখন দেখি, ফুল তার নিজের সৌন্দর্য দ্বারা অন্যকে পুলকিত করছে। গীতায় বর্ণিত আছে-

‘ফুলকে দেখ/ একবার ফুলের দিকে তাকাও
নিঃস্বার্থভাবে যে সুগন্ধ ছড়ায় এবং মধু দিয়ে যায়, যখন এর কাজ শেষ হয় –
এ নিঃশব্দে ঝরে যায়।
ফুলের মতো হওয়ার চেষ্টা করো
এর গুণাগুণগুলো নিজের মাঝ বপন করো।’

.

আমরা যেভাবে একটি রকেট লঞ্চিং ফ্যাসিলিটি পেয়েছি তা সকল প্রজন্মের জন্যই একটি অনুপ্রেরণামূলক গল্প’। এটি হলো কিছু মনের সমন্বয়। পৃথিবীর অন্য কোথাও কখনও কোনো চার্চ কর্তৃপক্ষ রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠার জন্য চার্চ দিয়ে দেয়নি। শুধুমাত্র ভারতেই এটা সম্ভব হয়ে। এই খবর প্রচার পেতেই হবে। এর মূলশিক্ষা হলো ধর্মের সর্বোত্তম উপাদানকে আধ্যাত্মিকতার রূপান্তর বা সমাজ গঠনে সহায়ক।

যাই হোক, মূল ঘটনায় ফিরে আসি। ISRO-তে আমি আমার দায়িত্ব পালন করছিলাম। এদিকে ড. সারাভাইয়ের সাথে প্রায়ই আমার যোগাযোগ হতে লাগল। তিনি দেশের স্পেস প্রোগ্রাম নিয়ে তার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করছিলেন। প্রথমে তিনি থুম্বায় প্রতিষ্ঠা করেন স্পেস রিসার্চ ফ্যামিলি এরপর তিনি সরকারকে রাজি করাচ্ছিলেন ভারতে নিজস্ব এসএলইউ (স্যাটেলাইট লঞ্চিং ভেহিক্যাল) প্রতিষ্ঠা করাতে এবং একই সময়ে একটি Rocket- Assisted Take-Off System (RATO) তৈরি করতে। এর মাধ্যমে শত দুরাবস্থার মধ্যেও মিলিটারি এয়ারক্রাফট টেক অফ করতে পারবে। আমি তার চিন্তা এবং সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা দেখে অবাক হতাম। তিনি সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করতে পারতেন এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অসাধারণ। আমরা যা দেখতে পেতাম না তিনি সেই সম্ভাবনা পরিষ্কার দেখতে পেতেন এবং যা বাস্তবে রূপদান করার সামর্থ্য রাখতেন।

ড. সারাভাইয়ের নেতৃত্ব এতটাই প্রবল ছিল যে, তিনি সংস্থার সর্বজ্যেষ্ঠ কর্মীকেও উদ্দেশ্য অর্জনের পথে পরিচালনা এবং প্রেরণা দিতে পারতেন। আমার মতে, তার কিছু মৌলিক গুণাবলির জন্য তিনি একজন ভালো নেতা হতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমি একে একে তার সেই গুণাবলির সবগুলো বলছি।

প্রথমত, তিনি সর্বদা শুনতেও প্রস্তুত থাকতেন। ভারতের বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের উন্নতির মূল অন্তরায় হলো ক্ষমতাসীন পদে থাকা লোকজনের নিজেদের অধীনস্থদের কথা শোনার অনিচ্ছা। এক ধরনের বিশ্বাস বিরাজমান যে, যত সিদ্ধান্ত এবং ধারণা সব উপর থেকে নিচে, এই সাংগঠনিক কাঠামো অনুসারে আসবে। ভালো নেতৃত্ব এবং গোয়ার্তুমির মাঝে এটি একটি স্বচ্ছ সীমারেখা। আমরা প্রায় সময়ই অবাক হতাম এই ভেবে যে, ড. সারাভাই আমাদের সবাইকে কী পরিমাণ বিশ্বাস করেন।

INCOSPAR-এ আমরা ছিলাম একদল তরুণ এবং অনভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার, যারা উদ্যোম এবং আগ্রহে ভরপুর। তিনি আমাদের মাঝে একধরনের অদম্য স্পৃহা গড়ে তোলেন। তিনি এমনটা

করেছেন, আমাদেরকে নিজের পরিকল্পনার অংশ করে নিয়ে এবং আমাদের সবাইকে একটি বৃহৎ লক্ষ্যের অংশীদারে পরিণত করে। তিনি থুম্বায় পরিদর্শনে আসলে অক্লান্ত দিন কাটাতেন। কারণ আমরা সবাই তাকে নতুন কাজগুলো দেখাতে চাইতাম। সেটা কোনো নতুন ডিজাইন হোক বা নতুন কোনো নির্মাণ অথবা কোনো প্রশাসনকি পদ্ধতি। তিনি আমাদের সবাইকেই নিজেদের মতো নেতা হওয়ার মনোযাগ নিয়ে গড়ে তুলেছেন।

আমার মতে একজন আদর্শ, নেতার মাঝে দ্বিতীয় যে গুণটি থাকা উচিত তা হলো—সৃজনশীল চিন্তা-ভাবনা। যা ড. সারাভাইয়ের অন্যতম সেরা গুণগুলোর একটি। যখন তিনি একই সাথে এসএলভি এবং র‍্যাটো তৈরির সিদ্ধান্ত নিলেন, আমরা কেউই এই দুটোর মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে পেলাম না। প্রাথমিকভাবে কোনো সামঞ্জস্য না পেলেও পরবর্তীতে প্রমাণ হয় যে, এই দুটো জিনিস তৈরি একে অপরের সাথে গভীরভাবে জড়িত। আমি খুব দ্রুত সামঞ্জস্যগুলো ধরতে পেরেছিলাম। তাই আমি আগে থেকেই নিজে প্রস্তুত করে নিতে পেরেছি। প্রস্তুতি এই জন্য যে, আমার ল্যাবরেটরি থেকে আমার ওপর অতি জরুরি কিছু কাজের দায়িত্ব দেয়া হবে। আরও বৃহৎ ক্ষেত্রে ড. সারাভাই ভারতের স্পেস প্রোগ্রামের মাঝে একই সাথে রকেটে স্যাটেলাইট লঞ্চিং ভেহিক্যালস এবং লঞ্চিং ফেসিলিটির সমন্বয়ের কথা ভেবে রেখেছিলেন। একই সাথে আহমেদাবাদের Space Science and Technology Centre and Physical Research Laboratory-তে রকেট জ্বালানি, প্রোপুলেশন সিস্টেম, অ্যারোনটিক এবং অ্যারোস্পেস ম্যাটারিয়াল ও ট্র্যাকিং সিস্টেমের জন্য বিস্তর পরিধির কাজ হাতে নেয়া হয়।

যখন ড. সারাভাই ভারতের নিজস্ব রকেট তৈরির স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করেছিলেন তখন রাজনৈতিক নেতাবৃন্দের সাথে তাকেও প্রশ্নের সম্মুখিন হতে হয়েছিল। প্রশ্ন ছিল-ভারত যখন দারিদ্রতা এবং ক্ষুধার পাশবিক শক্তির সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে, এমন অবস্থায় এই ধরনের প্রোগ্রামের প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু?

শত প্রশ্নের মুখেও তিনি জওহরলাল নেহেরুর সাথে চুক্তি বজায় রেখেছিলেন যে-ভারত বিশ্বায়নের যুগে বিশ্বের সাথে তখনই তাল মেলাতে পারবে যখন প্রতিটি ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করতে পারবে।

একই সাথে জীবনের নানা সমস্যা সমাধানে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারবে। আমাদের স্পেস প্রোগ্রাম কখনই কেবল জাতির অভিজাত সমাজের জন্য ছিল না-এমনকি অন্য কোনো দেশের সাথে প্রতিযোগিতা করার সাথেও এর কোনো সম্পৃক্ততা নেই। এই প্রোগ্রাম ছিল উন্নত ভারতের টেলি কমিউনিকেশন, মিটারোলজি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সক্ষমতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয়।

তৃতীয় যে গুণটি আমি ড. সারাভাইয়ের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলাম, তা হলো, দল তৈরি করার ক্ষমতা। তার এই গুণাবলিটি আমি নিজের মাঝে বপন করার চেষ্টা করেছি। ড. সারাভাই সবসময় সঠিক কাজের জন্য সঠিক মানুষটিকে খুঁজে বের করে নিতেন। এরপর তিনি সেই লোককে উপযুক্ত

করে নিতেন। কোনো ধরনের অভিজ্ঞতা থাকা বা না থাকার ওপর তিনি খুব বেশি গুরুত্ব দিতেন না।

সবার মাঝে উৎসাহ জাগিয়ে তোলা তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল। একজন আদর্শ নেতার মাঝে এই গুণাবলি খুবই দরকারি। বিশেষ করে আমাদের কর্মক্ষেত্রে। কেননা আমাদের প্রায়ই দুরাবস্থা এবং ব্যর্থতার সম্মুখিন হতে হয়। প্রয়োজনের সময় জীর্ণ চিত্রপট তিনি আলোকিত করে প্রদর্শন করতে পারতেন। তিনি আমাদের প্রশংসা করতেন যদি তিনি আমাদের কাজে সন্তুষ্ট হতেন। আমরা অনেক সময় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে ব্যর্থ হলেও তিনি আমাদের কাজের প্রশংসা করতেন। আর স্বাচ্ছন্দ্য পরিবেশ বজায় রাখার জন্য এবং আমাদের দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য তিনি মজা করতেও কার্পণ্য করতেন না। এইসব গুণাবলি দ্বারা তিনি নিজের দল এবং প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। যারা তার প্রতি এবং তার স্বপ্নের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, প্রতিটি মানুষই জানে যে, কিছু না কিছু অবদান রাখতে পারবে। আর তার এই অবদানের স্বীকৃতি দেয়া হবে এবং মূল্যায়ন করা হবে।

.

অবশেষে তার আর একটি গুণ বলে শেষ করতে চাই। তা হলো, ব্যর্থতাকে অতিক্রম করতে পারার ক্ষমতা। আমার একটি ঘটনা মনে পড়ে এ বিষয়ে। একবার পরিদর্শনের জন্য থুম্বায় এসেছিলেন। আমরা তখন এসএলভি স্টেজ-এর কাজ করছিলাম। আর আমাদের কাজের অগ্রগতির জানানোর জন্য তাকে কার্যপ্রদর্শন করি। বিষয়টা এমন যে, ড. সারাভাই যখন একটি সুইচ টিপবেন তখন টাইম সার্কিটের মাধ্যমে পাইরো সিস্টেম চালু হবে। তবে তিনি যখন সুইচ টিপলেন তখন কিছুই ঘটল না। আমি প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম। আমার সহকর্মী প্রমদ কালীও ভীষণ ধাক্কা খেল। কারণ টাইমার সিস্টেম ডিজাইন তার করা এবং তিনি নিজেই এই সার্কিট তৈরি করেছিলেন। আমরা দ্রুত টাইমার সার্কিটের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে পাইরো সিস্টেমের সাথে সরাসরি সংযোগ দিলাম। কারণ আমাদের ধারণা ছিল, সমস্যা মূলত টাইমার সার্কিটের। যখন সারাভাই আবার সুইচ টিপলেন তখন যা হবার কথা তাই হলো। পাইরোতেও আগুন জ্বলে উঠল এবং নোসকন অগ্রসর হলো। ড. সারাভাই আমাদের সাফল্যের জন্য আমাদেরকে অভিনন্দন জানালেন তবে আমাদের বিদায় জানাবার সময় পরে কেমন যেন চিন্তিত দেখাচ্ছিল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা কেভোলাম প্যালেস হোটেলে আমাকে তার সাথে দেখা করতে বলা হয়। আমার এক ধরনের অস্বস্তি লাগছিল। তিনি উষ্ণভাবে আমাকে স্বাগতম জানালেন এবং রকেট লঞ্চিং স্টেশন নিয়ে কথা বললেন। এরপর তিনি সকালের কথা তুললেন। আমি কঠিন কিছু কথা শোনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করলাম। তবে কঠিন কথা তো দূরের কথা তিনি আরও গভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন। তিনি জানতে চাইলেন, আমরা কাজ করে আনন্দ পাচ্ছি কী? এবং এই কাজ আমাদের জন্য উপযুক্ত কাজ কি না। অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলে আমরা সকালের ব্যর্থতার কারণ খুঁজে বের করলাম। তিনি আমাকে ভুলের কারণ ব্যাখ্যা করলেন। এরপর অনেক রাত পর্যন্ত ড. সারাভাই নতুন ডিপার্টমেন্ট 'দ্য রকেট ইঞ্জিনিয়ার সেকশন' নিয়ে অনেক আলোচনা করলেন।

আমি আগেই বলেছি সফলতা এবং ব্যর্থতা উভয়ই প্রতিটি কাজের অংশ। বিশেষ করে, আমাদের কাজগুলো যেখানে অনেকগুলো সিস্টেম নিয়ে এক সাথে কাজ করা হয়। আর একেক সিস্টেমের দায়িত্ব থাকে এক এক দলের। এমতাবস্থায় কোনো একটি দলের সামান্য ভুলের কারণে বছরের পর বছর করা কঠোর পরিশ্রম নিমিষেই শেষ হয়ে যেতে পারে।

ড. সারাভাই ভুলগুলোকে কাজে লাগাতে জানতেন। তিনি এই ভুলগুলো ব্যবহার করে নতুন পদ্ধতি তৈরি করতেন। ব্যর্থতাকে বিশ্লেষণ করে এর কারণ এবং পরবর্তী ধাপ বের করার তার স্বাতন্ত্র্য ক্ষমতা ছিল। তিনি ভুল হতে তার প্রশ্রয় দিতেন এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানান চেষ্টা করতেন, কীভাবে সেগুলো ঠিক করা যায়। এতে করে আমরা স্বস্তিতে কোনো প্রজেক্ট সম্পন্ন করতে পারতাম। ব্যর্থতা নিয়ে আমাদের কোনো ভয় ছিল না।

.

ISRO বর্তমানে যত স্পেস প্রযুক্তিসম্পন্ন দেশগুলো তার সমপর্যায়ে উপনিত হয়েছে। ISRO বিশ্বমানের স্যাটেলাইটস, স্যাটালাইট এবং রকেট লঞ্চার তৈরি করেছে। এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার, টেলিকম্যুনিকেশন আবিষ্কার এবং শিক্ষাক্ষেত্রে দেশকে অমূল্য সেবা দিয়ে আসছে।

ISRO চাঁদে একটি অরবিটার পাঠিয়েছে। এর নাম চন্দ্রযান-১। এবং অতি শীঘ্রই মঙ্গলেও মহাকাশযান পাঠানো হবে। আর এই সবই সম্ভব হয়ে ড. সারাভাইয়ের জন্য। যাকে সহযোগিতা করেছেন সতীশ ধাওয়ান, সতীশ ধাওয়ান এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান।

ড. সারাভাইয়ের সাথে আমার সম্পর্ক অনেকটা আবেগপ্রবণ এবং মানসিক। নানা সময়ের মধ্যে তিনি আমার ওপর অগাধ বিশ্বাস এবং গভীর আস্থা রেখেছেন, যাতে করে আমি দলগুলোকে নির্দেশনা দিয়ে যেতে পারি। নতুন ডিজাইন এবং মেকানিজম তৈরির নির্দেশনা। এর মাধ্যমে ভারত সামনে এগিয়ে যাবে এবং বিজ্ঞান ও প্রতিরক্ষার দিক দিয়ে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবে।

তিনি একজন তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন, সেই তরুণ ইঞ্জিনিয়ার সততার সাথে পরিষ্কারভাবে তার প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছিল এবং তার নিজের রকেট এবং মিসাইল তৈরির স্বপ্ন তাকে জানিয়ে ছিল।

তিনি সবসময় আমার পাশে ছিলেন। আমার ব্যর্থতা, সফলতা, অনিশ্চয়তা সকল মুহূর্তে আমাকে পথ-প্রদর্শন করেছেন। আঙুল তুলে সঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, যখন আমি দ্বিধায় ভুগছিলাম। তিনি ছিলেন একজন উচ্চমানের মানুষ। আর তার ছায়ায় গড়ে উঠতে পেরে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করি।

.

ড. সারাভাইয়ের মৃত্যুর সংবাদ আমাকে নিষ্ঠুরভাবে হতাশ করে ফেলে। কারণ এ ধরনের সংবাদ ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লি থেকে তার সাথে আমার কথা হয়। আমি দিল্লিতে একটা মিসাইল প্যানেল মিটিং-এ ছিলাম। সেই সম্পর্কেই তাকে জানাচ্ছিলাম। তিনি ছিলেন তখন থুম্বায়। তিনি তার সাথে ত্রিভান্ডাম এয়ারপোর্টে দেখা করতে বললেন। আমি দিল্লি থেকে ল্যান্ড করব আর তিনি

সেখান থেকে বোম্বে (বর্তমান মুম্বাই) যাবেন। তবে আমাদের আর দেখা হয়নি। আমি ঠিকই এয়ারপোর্টে তার অপেক্ষায় ছিলাম। কয়েক ঘন্টা পর জানলাম, তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। আমি জানতে পারলাম যে, আমাদের কথা হবার এক ঘন্টার মধ্যেই তিনি মারা গেছেন।

যে ব্যক্তি তরুণ বিজ্ঞানী এবং ইঞ্জিনিয়ারদের গড়ে তুলছেন, সে ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ সব বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রধান। যিনি একজন স্বনামধন্য নেতা, তিনি আর আমাদের মাঝে নেই। তবে দুনিয়া ত্যাগ করার পূর্বে তিনি আমাদেরকে তার জ্ঞান দিয়ে সজ্জিত করে গেছেন। আমাদেরকে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলেছেন। যেকোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার উপযুক্ত করে দিয়েছেন। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের জন্য তার সবচেয়ে বড় অবদান হলো- আমাদের সম্ভাবনাকে তিনি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন। সেই প্রথম থেকেই আমার জীবনে এ-ঘটনা নতুন নয়। যারা আমার কাছের মানুষ, তারা সবাই হঠাৎ করেই আমাকে ছেড়ে চলে যায়। কোনো কিছু না জানিয়েই।

এর থেকে আমি কী শিক্ষা পেলাম? প্রতিটি মানুষের মৃত্যুর সাথে আমার ভারাক্রান্ত মনে দুঃখের নতুন একটি স্তর যোগ হচ্ছিল। আর প্রতিবারই তাদেঁর স্মরণ করে তাদের কিছুটা আমি নিজের মাঝে আনার চেষ্টা করেছি। সেটা ভালোভাবেই হোক বা নিষ্ঠার সাথে হোক।

ড. সারাভাইয়ের ক্ষেত্রে আমি লাভ করেছি সামনে দেখার ক্ষমতা। পরিকল্পনার নকশা করার ক্ষমতা। তৈরি করা ক্ষমতা। যদি আমি নিজের বিভিন্ন দায়িত্বের মধ্যে দিয়ে সামান্য কিছু অর্জন করতে পারি, আমি সেই অর্জনকে বিবেচনা করব ভারতকে নিয়ে তার বৃহৎ প্রত্যাশার অংশ হিসেবে।

বিজ্ঞানের মাঝে জীবন

বিজ্ঞানের মাঝে জীবন

১৯৯৮ সালে ভারতে, পোখরায় দ্বিতীয়বারের মতো পারমাণবিক পরীক্ষা চালানো হয়। এই পরীক্ষায় আমি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখি। এই পরীক্ষণের পর আমাকে বিভিন্ন উপাধি দেওয়া হয়। এই উপাধিগুলোর একটা আমার নামের সাথে বহু বছর ধরে জুড়ে দেওয়া হয়। এমনকি আমার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেবার পরও। সেই উপাধি হলো 'মিসাইল ম্যান'। আমাকে যখন এই উপাধিতে সম্বোধন করা হয়, তখন আমার অনেক মজা লাগে। এই উপাধির কারণে একজন বিজ্ঞানীর বদলে নিজেকে বাচ্চাদের সুপার-হিরো বলে বেশি মনে হয়। তবে সেটা কোনো ব্যাপারই নয়। এই দেশের বহু লোক, এই উপাধি দ্বারা আমার প্রতি তাদের ভালোবাসা এবং সম্মানের প্রকাশ করে থাকে। আর একই সাথে এই উপাধির মাধ্যমে বিজ্ঞানের জগতে এবং রকেট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জগতে আমি নিজের আলাদা স্বত্বা খুঁজে পাই। তাই আমার কাছে এই উপাধি এক ধরনের প্রতীকের মতো।

বিজ্ঞানের জগতে আমার এই যাত্রা বহু আগে শুরু হয়। আমাকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। এই পথ এতটাই দীর্ঘ যে, মাঝে মাঝে আমি অবাক হয়ে ভাবি, আমার জীবন কি আসলেই এতটা ঘটনাবহুল? নাকি আমি কোনো গল্পের বই পড়ছি। তবে এ সবই সত্য। কোনো কল্পনা নয়। এই দীর্ঘ পথের কারণেই আমি একজন সফল ব্যক্তি হতে পেরেছি, যে বিজ্ঞানের পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আর এই দীর্ঘ পথের কথা যখন আমি স্মরণ করি তখন নিজেকে একটি নৌকায় দেখতে পাই। যে উৎস থেকে যাত্রা শুরু করে স্রোতের অনুকূলে এগিয়েই যাচ্ছে। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছানোর আগ পর্যন্ত এগিয়েই যাচ্ছে। নিজের জীবনের পথ খুঁজে বেরাচ্ছে।

আমার প্রকৃত শিক্ষা শুরু হয়, রামেশ্বরাম ত্যাগ করার পর। যখন আমি হাই স্কুলে পড়ালেখা করার জন্য রামনাথপুরে চলে আসি। আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, সেবারই প্রথম আমি রামেশ্বরামের বাইরের জগতে প্রবেশ করি। রামেশ্বরামের পরিবেশ, আমার মা এবং পরিচিত সকল কিছু থেকে দূরে। আমি তখন আর পাঁচ-দশটা ছোট শহরে মানুষ হওয়া ছেলের মতোই লাজুক ছিলাম। কথা বলতে ভয় লাগত।

রামনাথপুরের Schwartz High School এই প্রথমবারের মতো বিজ্ঞানের অসামান্য অবদানগুলোর সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়। আর আমার কাছে এই অবদানগুলো এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যে, আমার তা বুঝতে একটুও অসুবিধা হয়নি। সেই স্কুলে একজন শিক্ষক ছিল। তার নাম রেভেরেন্দ ইয়াদুরাই সলোমন। তার সাথে আমার গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়। সেই সম্পর্কের মধ্যে এক ধরনের বিশ্বাস বিদ্যমান ছিল। তার মাঝে আমি একজন পথ-প্রদর্শকের ছায়া দেখতে পেতাম। যে আমাকে সামনে এগোবার পথ বাতলে দেবে।

আমি পাখিদের আকাশে ওড়া দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতাম। ঘন্টার পর ঘন্টা বসে এই দৃশ্য দেখতাম। আমার কোনো ক্লান্তি ছিল না। পাখিদের ওড়ার ধরণ, তাদের গন্তব্য সবই আমি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতাম। এই পাখিদের দেখতে দেখতেই খুব ছোট বয়স থেকেই আমার মাঝে আকাশে

উড়ে বেরানোর আকাঙ্ক্ষার জন্ম নেয়। একদিন আমি আকাশে উড়ে বেরানো নিয়ে পদার্থবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা পড়ছিলাম। এমন সময় আমাদের শিক্ষক মি. সলোমন আমাদের কিছু ছাত্রকে সমুদ্র তীরে নিয়ে এলেন। সেখানে তিনি আমাদেরকে আঙুল তুলে কিছু পাখি দেখালেন। আমরা সবাই সমুদ্র তীরে দাঁড়িয়ে, আমাদের কানে আসছে সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন। সেই গর্জন ছাপিয়ে কানে আসছে, বক এবং সিগালের মায়াবি কান্না। তারা আকাশের বহু উপর দিয়ে উড়ে বেরাচ্ছে।

আমাদের শিক্ষক এই পাখির উড়ে বেরানোর কায়দার দিকে নির্দেশ করে আমাদের অ্যারোডিনামিক্স, অ্যারোনেটিকাল ডিজাইন জেট স্টিম এবং এয়ার ফ্লোস ব্যাখ্যা করলেন। আমাদের মোট ১৫ জনের একটি দলকে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন। আমিও তার একজন ছিলাম। এবং আমার কাছে এই ক্লাসটি ছিল বিজ্ঞান নিয়ে এ-যাবৎ করা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস। আমার কাছে যা ছিল বিস্ময় এবং আকর্ষণের ব্যাপার, তা নিখুঁতভাবে আমার কাছে ব্যাখ্যা করা হচ্ছিল। পরিষ্কার ব্যাখ্যা। আমার কাছে মনে হলো, এতদিন আমার সামনে এক স্তর মেঘ জমেছিল। আজ সে মেঘের স্তর সরে গেছে। আমি আমার জ্ঞান- পিপাসু চোখ দিয়ে পরিষ্কারভাবে আমার সামনের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। আমি আরও জানতে চাচ্ছিলাম। আমার তৃষ্ণা তখনও মেটেনি।

.

আমি স্কুল ছেড়ে কলেজে উঠলাম। আমার কলেজের নাম ছিল সেন্ট জোসেফ। আমার জন্য আরও অনেক বিস্ময়কর মুহূর্ত অপেক্ষা করছিল। আমি আগেই অনুধাবন করেছি যে, নিজের মস্তিষ্ক এবং চোখ-কান সব সময় খোলা রাখতে হবে। এভাবে করে আমার মস্তিষ্ক আরো ধারাল হলো এবং আমার মনোযোগ- শক্তিও বৃদ্ধি পেল। তাই এমন কিছুই রইল না, যা আমি শিখতে এবং পর্যবেক্ষণ করতে পারতাম না।

সেন্ট জোসেফ কলেজে প্রফেসর চিন্নাদুরাই এবং প্রফেসর কৃষ্ণমূর্তি সাব- অ্যাটোমিক ফিজিক্সের বর্ণনা দেন। আমার কাছে এই বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ নতুন। আমার কাছে প্রথমবারের মতো 'ম্যাটার' এবং 'ডিকেই'-এর গুপ্ত দুনিয়া উন্মোচিত হলো। আমি এই দুটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করা শুরু করলাম। আমি বিভিন্ন পদার্থের 'রেডি?-এক্টিভ ডিকেই' এবং 'হাফ লাইফ পিরিয়ড' সম্পর্কে শিখলাম। আমার কাছে এই নতুন ভুবন আগের থেকে অনেকটা ভিন্ন মনে হলো আগের সলিড গঠনের চেয়ে।

আমি বিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতার দ্বৈততা নিয়েও চিন্তা করলাম। এই দুটি জিনিস কি সত্যিকার অর্থেই একে অন্যের থেকে ভিন্ন (যেমনটা ভাবা হয়ে থাকে)? যদি সাব-অ্যাটোমিক লেভেল সকল পারটিকেলসকে অস্থিতিশীল এবং সংকুচিত করা যায়, তবে মানব জীবন থেকে এগুলোকে কিভাবে দূরে সরানো যাবে?

বিজ্ঞান সকল প্রাকৃতিক ঘটনার উত্তর খুঁজে বেড়ায় আর আধ্যাত্মিকতা আমাদেরকে বুঝতে সহায়তা করে যে, মহাবিশ্বের ঠিক কোথায় আমার অবস্থান। বিজ্ঞান জগতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোকে বিশ্লেষণ করে সলিড সম্ভাবনা এবং বিভিন্ন গাণিতিক সূত্র দ্বারা। আর আধ্যাত্মিকতা এর বিশ্লেষণ

করে মানুষের মনের গুপ্তপথ উন্মোচনের মাধ্যমে। তার হৃদয় এবং মনের ধারণকৃত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজের গভীর থেকে গভীরতর স্বত্বার অনুসন্ধানের মাধ্যমে। আমার কাছে ধীরে ধীরে ব্যাপারটা পরিষ্কার হচ্ছিল। ধীরে ধীরে আমি যেই ভুবনে প্রবেশ করছিলাম এবং আমার বাবা আমাকে যে ভুবনের মাঝে গড়ে তুলেছেন, তারা মোটেই একে অপরের থেকে দূরে নয়। তারা নিকটবর্তী এবং এদের মধ্যে যোগ-সংযোগ রয়েছে।

.

কলেজ জীবন শেষে আমি MIT-তে আরনেটিকাল ইঞ্জিনিইয়ারিং নিয়ে পড়ালেখা করি। এখানে দুটো বাতিল এয়ারক্রাফট ছিল। এই এয়ারক্রাফট দুটো দেখে আমি পাইলট হবার স্বপ্ন দেখি।ওড়া-উড়ি নিয়ে আমার আগ্রহ আরো দৃঢ় হয়। মধ যেমন আলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়, আমিও তেমনিভাবে এই এয়ারক্রাফট দুটোর প্রতি আকৃষ্ট হতাম। এবং একটা সময় আমি বিশ্বাস করতে শুরু করি, মানুষের তৈরি এই আকাশযানেই আমি আমার ক্যারিয়ার গড়ব। এছাড়া আমি আর কিছুই চাই না।

MIT-এর তিনজন শিক্ষক আমার এ-স্বপ্নের আকৃতি গড়ে দেন। এবং এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের পথ বাতলে দেন। প্রফেসর স্পন্ডার। তিনি একজন অস্ট্রিয়ান। তিনি আমাকে টেকনিক্যাল এরোডায়নামিক্স শেখান। প্রফেসর নরসিংহ রাও। তিনি আমাকে থিওরেটিক্যাল এরোডায়নামিক্স শেখান। প্রফেসর পান্ডালাই। তিনি আমাকে এরোস্ট্রাকচার ডিজাইন এবং অ্যানালিসিস শেখান। এই তিনজন শিক্ষকের কারণেই আমি উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম, অ্যারোনেটিক্সের জগত কতটা বিচিত্রপূর্ণ হতে পারে। যে সকল বিষয়কে আমরা মুভমেন্ট এবং ফ্লো হিসেবে আখ্যায়িত সেগুলো তাদের কম্পনেন্টসে ভাঙা হয়। আর এর মাধ্যমেই ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যে, আকাশে কোনো বস্তু কেন এবং কিভাবে নড়াচড়া করে। আমি ফ্লুইড ডিনামিক্স, মুডস অব মোশন, শক ওয়েভ এবং শক ওয়েভ ড্রাগ-এর জটিল দুনিয়ায় নিজেকে হারিয়ে ফেলি। একই সময়ে এরোপ্লেন-এর গঠনমূলক বৈশিষ্ট্যগুলো আমার কাছে পরিষ্কার হয়। আমি বাইপ্লেন, মনোপ্লেন, টেইললেসপ্লেন নিয়ে এবং আরো অনেক বিষয় নিয়ে প্রচুর পড়াশুনা করি।

MIT-তে অধ্যয়নকালে এমন অনেক সময় ছিল, যখন আমি বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র অনুসন্ধান নিয়ে পুরোপুরি নিমগ্ন থাকতাম। এমন সময় দেশের ইতিহাসেও নতুন যুগের সূচনা হয়। আর এই সূচনা হয় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর মাধ্যমে। তিনি দেশের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রগুলোর উন্নয়নের ওপর অধিক জোর দেন। প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই, বিশেষ করে আমি যে প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করছিলাম, এমন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরিবর্তন আসছিল। আমি লক্ষ্য করলাম, আমাদের পুরনো ধাঁচের চিন্তা-ভাবনা এবং ধ্যান-ধারণা ছেড়ে নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য অধিক উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।

.

বিজ্ঞান আমাদের জন্য সবচেয়ে কার্যকরী হবে যখন আমরা জ্ঞান অর্জনের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারব। রামেশ্বরামের আধ্যাত্মিক পরিবেশের মাঝে বড় হওয়ার কারণে আমাকে এমনটা করতে বেশ সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। তারপরও আমি লক্ষ্য করলাম, আমি ঠিকভাবেই বিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতার মৌলিকতার ওপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিতে পারছি। আমি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিলাম না, আমরা যা কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করতে পারি কেবল তাই সঠিক, বাকি সব মিথ্যা।

আমি এমন একটি পরিবেশে বেড়ে উঠেছি, যেখানে আমাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, সত্য, এই বাস্তবিক জীবনের বাইরে অবস্থান করে। আধ্যাত্মিক ভুবনে। আর প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব আত্মনুসন্ধানের মাধ্যমে। তবে আমি ধীরে ধীরে এমন একটি জগতের অংশে পরিণত হচ্ছিলাম, যে জগত প্রমাণ, পরীক্ষণ এবং সূত্র নির্ভর। তবে শেষপর্যন্ত এই বিষয়ে আমি নিজের ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি। কিন্তু এই ধারণা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে আমার অনেকটা সময় লেগেছে। বেশ কয়েক বছর সময়।

অবশেষে আমি MIT-তে থেকে একজন ইঞ্জিনিয়ারের মর্যাদা পাই। এবং MIT জীবনের ইতি টানি। তবে তখনও রকেট এবং মিসাইল নিয়ে আমার অনেক কিছু শেখা বাকি। কারণ এই রকেট এবং মিসাইলের জগতেই আমি আমার ক্যারিয়ার গড়তে চলেছি। আমি তখন কেবল এটুকুই জানতাম যে, আমার সামনে পুরো দুনিয়াটা পড়ে আছে। আমার এই দুনিয়ায় অনুসন্ধান করে বেরাতে হবে। আর আমি সংকল্পবদ্ধ ছিলাম, আমি এই দুনিয়ার আকাশে উড়ে বেরানোর মাধ্যম অনুসন্ধান করব।

DTD&P (Air)-এ কয়েক বছর কাজ করার পর আমি ব্যাঙ্গালোরের Aeronautical Development Establishment (ADE)-এ কাজ করি। DTD&P (Air)-এ মূলত আমার কাজ ছিল, বিভিন্ন সিস্টেম ডিজাইন এবং নির্মাণ করা। আর এই সকল সিস্টেমের মধ্যে ভারটিকাল ল্যান্ডিং থেকে শুরু করে টেকঅফ প্লাটফর্ম-এমনকি হট ককপিঠ নির্মাণও অন্তর্ভুক্ত। তবে Aeronautical Development Establishment (ADE)-এ এসে আমি বুঝতে পারলাম, আমার হাতে বড় একটা সুযোগ এসেছে। নতুন কিছু তৈরি এবং পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভের সুযোগ, যা আমার ক্যারিয়ার গড়ায় সহায়ক হবে।

Aeronautical Development Establishment (ADE)-এ আমার গ্রাউন্ড হ্যান্ডেলিং ইকুয়েপমেন্ট-এর জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে, একটি Ground Equipment Machine (GEM) তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। ADE-এর ডিরেক্টর ড. মেডিরাত্তা, চারজনের একটি ছোট দল গঠন করলেন। তিনি আমাকে এই দলের প্রধানের দায়িত্ব দিলেন। আমাদের দলের জন্য এই GEM তৈরি ছিল বিরাট এক চ্যালেঞ্জ। এই প্রযুক্তি নিয়ে তেমন কোনো বইপত্রও নেই। এমনকি আমাদের এই প্রযুক্তি তৈরিতে সহযোগিতা করার মতো কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তিও ছিল না। এর আগে এই প্রযুক্তি নিয়ে কোনো ডিজাইন তৈরি হয়নি। তাই আমাদের কাজে লাগার মতো কোনো রেকর্ডও হাতে ছিল না। সত্যি কথা বলতে, আমাদের দলের কাছে নির্দেশ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সফলভাবে এই ফ্লাইং মেশিন তৈরির নির্দেশ এবং আমাদেরকে সময়ের মধ্যেই তা সম্পন্ন করতে হবে। এখন যদি

চিন্তা করি তাহলে মনে হয়, আমরা যে ইঞ্জিনিয়াররা এই দায়িত্বে ছিলাম, যারা ফ্লাইং মেশিন তো দূরের কথা, কোনো ধরনের মেশিন নির্মাণেরই বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই, তাদের কাছে এই কাজটি ছিল অসম্ভব এক চ্যালেঞ্জ।

আমাদেরকে প্রজেক্ট শেষ করার জন্য তিন বছর সময় দেয়া হয়। আমাদের প্রথম কয়মাস পার হয় শুধু কি করব, তার ভাবনা-চিন্তা নিয়ে। তবে এক পর্যায়ে এসে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আমাদের হাতে যে যন্ত্রপাতি আছে, তা নিয়েই কাজ শুরু করে দিতে হবে। এবং কাজ করতে করতে নতুন কিছুর প্রয়োজন হলে, তা এনে নিতে হবে। মাথার ওপর এত বড় বোঝা থাকা সত্ত্বেও এই প্রজেক্ট আমার খুবই ভালো লেগেছিল। কারণ এই প্রজেক্টে আমি আমার কল্পনাশক্তির পূর্ণ ব্যবহার করতে পারব। পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যে আমরা ডিজাইন তৈরি করে নির্মাণ কাজে হাত দিলাম।

এর মাঝে আমি বেশ ইতিবাচক এবং আত্মবিশ্বাসী একজন ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছি। তবে তার জন্য আমার বেড়ে ওঠা সেই মধ্যবিত্ত পরিবারের শিকড়কে আমি ভুলে যাইনি। তা আমার মাঝে সর্বদা থেকে যাবে। ধরুন, কাউকে যদি নতুন এক দুনিয়ায় ফেলে আসা হয়, যেখানে তাকে অন্যদের কাজের নির্দেশনা দিতে হবে, সেক্ষেত্রে তাকে জ্যেষ্ঠ সহকর্মীদের সন্দিহান দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। তার অবস্থা হবে অনেকটা আগুনে পোড়া লোহার মতো তপ্ত। আমার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছিল। যারা আমার মতো মিশুক স্বভাবের নয়, বরং লাজুক স্বভাবের এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে এসেছে, যা কোনোক্রমেই তাদের বড় শহরে মানুষ হওয়া সহকর্মীদের সাথে যায় না, তারা আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পছন্দ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত না চাপের সম্মুখীন হয়ে তাদের সবার মাঝে আসতে হয়। আমি বুঝতে পারছিলাম যে আমাকেও এখন সবার সামনে আনা হয়েছে। আর আমি আমার জ্ঞান এবং সৃজনশীলতা ব্যবহার করে, এই হোভারক্রাফট প্রজেক্টে সফলতা অর্জনের জন্য সংকল্পবদ্ধ ছিলাম।

প্রতিষ্ঠানে এমন অনেক লোক ছিল, যারা এই প্রজেক্টের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। প্রশ্ন তুলেছিল, এর পেছনে এতটা সময় এবং অর্থ ব্যয় করার কারণ নিয়ে। তারা এই প্রজেক্টে আমার জড়িত থাকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিল। তবে আমি আর আমার দল সেদিকে কান না দিয়ে আমাদের কাজ করে গেলাম। ধীরে ধীরে এবং ধাপে ধাপে আমাদের প্রোটোটাইপ আকার পেতে লাগল। MIT-তে পড়ার সময় একবার যখন প্রফেসর শ্রীনিভাসন আমার ডিজাইন বাতিল করে দিয়েছিলেন এবং যার কারণে আমাকে আবার সেই ডিজাইন তৈরি করতে হয়েছিল, তখন আমার মস্তিষ্ক যতটা সাবলীলভাবে কাজ করছিল, এবারও তাই হতে লাগল। আমার কাজের গতি সত্যিই অবিশ্বাস্য ছিল। আমি যেরকম করতে চাইছিলাম, ঠিক সেরকমই করতে পারছিলাম। আর একবার যদি আপনি আপনার মস্তিষ্কের দ্বার উন্মোচন করতে পারেন, তবে আর আপনার সামনে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। আর আপনার নিজের প্রতি যে বিশ্বাস জন্মাবে, তা কেউ আপনার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

তবে এই প্রজেক্ট কোনো সাধারণ প্রজেক্ট ছিল না। তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভি. কে. কৃষ্ণ মেনন স্বয়ং এই প্রজেক্টের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ভারতের প্রতিরক্ষার উন্নয়নের

সূচনা হবে এই প্রজেক্টের মধ্যদিয়ে। তিনি এক বছর যাবত আগ্রহ নিয়ে আমাদের কাজের তদারকি করলেন। তিনি যখন আমাদের কাজের অগ্রগতির অনুসন্ধান করতে এলেন, তখন তিনি ড. মেডিরাত্তাকে বলেন, 'কালাম এবং ওর দলের সাফল্য নিশ্চিত।'

হ্যাঁ, আমরা সফল হয়েছিলাম। তিন বছর শেষ হওয়ার আগেই আমাদের প্রোটোটাইপ তৈরি হয়ে গেল। আমরা আমাদের সাফল্য প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে দেখানোর জন্য প্রস্তুত ছিলাম। কৃষ্ণ মেনন নন্দীতে এলেন। আমি নিজ হাতেই তাকে সব কিছু দেখালাম। তবে এ-বিষয়ে তার নিরাপত্তারক্ষীরা তেমন একটা খুশি ছিল না। যাই হোক, প্রথমবারের মতো আমার মাঝে এক ধরনের অনুভূতি জন্মাল। জ্ঞান এবং দলগত মেধা কাজে লাগিয়ে নতুন কিছু তৈরি করার খুশির অনুভূতি। এমন একটা প্রোটোটাইপ তৈরি, যা এই দেশে প্রথম।

তবে এই অধ্যায়ের শুভ সমাপ্তি ঘটেনি। কৃষ্ণ মেনন ক্ষমতা ত্যাগ করার পর তার পরবর্তী মন্ত্রী, এই হোভারক্রাফট ব্যবহারে তার মতোন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেননি। এটা একটা সমালোচিত বিষয়ে পরিণত হলো। এবং এক সময় এর অবসান ঘটল। যদি আমার জীবনে কোনো কিছু আমাকে শেখায় যে-সব স্বপ্ন বাস্তবতা পায় না, তা হলো এই ঘটনা থেকে পাওয়া কঠোর শিক্ষা। প্রায়ই আমাদের এমন বাস্তবতার শিকার হতে হয়। এই বাস্তবতা হলো, আপনার নিজের চেয়েও বড় এবং ক্ষমতাশালী লোক রয়েছে যারা আপনার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসলের ফলাফল নির্ধারণ করবে নিজের স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যদিয়ে।

এই ঘটনা থেকে আমি আরেকটা শিক্ষা পেলাম। তা হলো, এমন অনেক ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে আমার বিচরণ এবং কোনো প্রভাব নেই। আমি কেবল আমার সেরাটুকু দিয়ে কাজ করে যেতে পারি, তবে এই কাজের ফলাফল নির্ধারিত হবে অন্য কারো হাতে। আর কে-ই বা সঠিকভাবে বলতে পারবে যে, আমাদের কাজের ফলাফল ঠিক কিভাবে আসবে?

আমি তখনও হতাশা কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। নন্দী যে উদ্দেশ্য তৈরি হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হওয়ার হতাশা। এমন সময় কিছু ঘটনা ঘটে যায়। আর এই ঘটনার জের ধরেই TIFR-এর অধ্যাপক এম.জি. কে. মেনন আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। আর এই ঘটনা প্রবাহের সমাপ্তি ঘটে আমার INCOSPAR-এ রকেট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যোগদানের মধ্যদিয়ে। সেখানে ড. ভিকরম সারাভাইয়ের তত্ত্বাবধানে আমি কাজ শুরু করলাম।

.

আমি INCOSPAR এবং এরপরে ISRO-তে কাজ করি। সেখানে আমাকে বিভিন্ন রকেট এবং মহাকাশযান তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়। এর মধ্যে সাউন্ডিং রকেট থেকে শুরু করে রকেটের পে-লোড এবং satellite launch vehicles(SLV)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ড. ভিকরম সারাভাইয়ের স্বপ্ন ছিল- ভারতের স্পেস প্রোগ্রামের উন্নয়ন। আর এই উন্নয়ন কেবল একটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ

থাকবে না। ভিন্ন ভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম একই সাথে সম্পন্ন করা হবে। আর আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি, আমি এরকম বহু প্রজেক্টের অংশ হতে পেরেছি।

যাই হোক, এই প্রজেক্টগুলোর মধ্যে যে প্রজেক্টটি আমার কাছে সবচেয়ে জটিল এবং চ্যালেঞ্জিং মনে হয়েছিল তা হলো, SLV তৈরি। আমি এই প্রজেক্টের প্রধান ছিলাম। এবং আমি নিজেই এর নির্দেশনা দিচ্ছিলাম। এই প্রজেক্টে মূলত এমন একটি লঞ্চিং ভেহিক্যাল তৈরি করতে হয়েছিল, যা পৃথিবী এবং ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের কক্ষপথে স্যাটেলাইট নিক্ষেপণ করতে পারবে। এই প্রজেক্টর সফলতা কেবল, পৃথিবীর বুকে ভারতকে উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর দেশ হিসেবে মর্যাদা এনে দেবে না, বরং এর মাধ্যমে আয়ও হবে। যে সকল দেশ পৃথিবী এবং অন্য গ্রহের কক্ষপথে নিজেদের স্যাটেলাইট নিক্ষেপণ করতে চাইছে, কিন্তু নিজেদের প্রযুক্তি না থাকায় তা সম্ভব হচ্ছে না, তাদের কাজ করে দিয়ে প্রচুর আয়ের সম্ভাবনাও তৈরি হবে। আমি আমার 'উইংস অব ফায়ার' বইটিতে এই স্যাটেলাইট তৈরির বিশদ বর্ণনা দিয়েছি। বিভিন্ন কারণে এই প্রজেক্ট সফলভাবে সম্পন্ন করতে গিয়ে ভালো রকমের জটিলতা পোহাতে হয়েছিল।

এরকম বড় মাপের প্রজেক্ট সফলভাবে সম্পন্ন করতে গেলে হাজারও জটিলতা দেখা দেয়। এবারও আমাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেয়া হয়। এবং প্রয়োজনীয় অর্থও বাজেট করে দেয়া হয়। আর আমার দায়িত্ব ছিল এই বেঁধে দেওয়া বাজেটের মধ্যে সফলভাবে প্রজেক্ট সম্পন্ন করা। আর এই সময়কালটায় আমি নিজের ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়েও জর্জরিত ছিলাম। মাত্র তিন বছরের মধ্যে আমি আমার তিনজন প্রিয় মানুষকে হারিয়েছি—আহমেদ জালালউদ্দিন, আমার বাবা এবং আমার মাকে। নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রেখে এবং কাজের ফলাফল নিয়ে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধতার মাধ্যমে আমি এই প্রজেক্টের সফলতার মুখ দেখতে পেয়েছিলাম।

এখন যদি কেউ আমাকে প্রশ্ন করে যে, SLV তৈরি করতে গিয়ে আমি কি শিক্ষা পেয়েছি, তাহলে আমার উত্তর হবে, 'তিনটি শিক্ষা'। প্রথমটি হলো, একটি দেশের উন্নয়নে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, গবেষণা এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অতুলনীয় ভূমিকার প্রমাণ। SLV তৈরিতে যে দলগুলো কাজ করছিল, সেই দলের সদস্যরা হয় বিজ্ঞানী, নয়তো গবেষক কিংবা ইঞ্জিনিয়ার। কে, কি করবে এবং কিভাবে করবে, দলনেতা হিসেবে সেই নির্দেশনা দেওয়ার দায়িত্ব ছিল আমার। আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে, বিজ্ঞান ওপেন-এন্ডেড এবং ব্যাখ্যামূলক। একজন অভিযাত্রী অজানা কোনো গন্তব্যে গেলে, যেভাবে অনুসন্ধানের মাধ্যমে উত্তর খুঁজে বার করে, বিজ্ঞানও ঠিক তাই করে। বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে, বিজ্ঞান নিজেই হলো এক অজানা গন্তব্য, যেখানে সকল কিছু সম্ভব। এবং একদিন বিজ্ঞান সবকিছুই ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং সবকিছুই সম্ভব করবে। বিজ্ঞান হলো গভীর আনন্দ এবং আবেগ।

অপরদিকে উন্নয়ন হলো, জোড়া দেওয়া সুতোর মতো। উন্নয়ন, বিজ্ঞানীদের সম্পাদিত কাজ গ্রহণ করে, একে আর কিছুটা সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। এখানে কোনো ভুল বা অনুসন্ধানের সুযোগ নেই। বরং উন্নয়ন ভুলকে কাজে লাগায়, নতুন করে সজ্জিতকরণে। তাই বিজ্ঞানীরা যখন আমাদেরকে নতুন সব উপায় বাতলে দিয়ে এবং ডিজাইন তৈরি করে লঞ্চিং ভেহিক্যাল তৈরির সম্ভাবনার দ্বার

উন্মোচন করছিল, ইঞ্জিনিয়াররা তখন আমাদেরকে বেঁধে দেওয়া সময় এবং সম্পদ ব্যবহার করে ফলাফলের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। এই ধরনের প্রজেক্টে সফলতা পেতে হলে সকল কাজই অতি সূক্ষ্মভাবে সম্পন্ন করতে হয়। সূক্ষ্ম এবং নিখুঁত। ঠিক যেমন অর্কেস্ট্রার প্রতিটি সুরের মধ্যে সমন্বয় আনা হয়।

দ্বিতীয় যে শিক্ষাটা আমি পাই তা হলো, সংকল্পবদ্ধতা। সেই বছরগুলোতে আমার মাথায় প্রজেক্ট ছাড়া আর কোনো চিন্তাই ছিল না। আর শুধু আমি না, আমার মতো আরও অনেকেই এই প্রজেক্টের পেছনে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দৃঢ় সংকল্প উজাড় করে দিতে থাকে। এই বিষয়ে ওয়ের্নহার ভন ব্রাউন যে জ্ঞানের বাণী আমাকে শোনান, তার সমতুল্য কিছু আমি কোনোদিন কারো কাছ থেকে শুনতে পাইনি। ভন ব্রাউন হলেন রকেট-এর ভুবনের কিংবদন্তি। তিনি v-2 মিসাইলের নির্মাতা। আর এই v-2 মিসাইলের আঘাতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লন্ডন টাওয়ার ধ্বংস হয়ে যায়। পরবর্তীতে তিনি NASA-র রকেটারি প্রোগ্রামে যোগদান করেন। সেখানে তিনি জুপিটার মিসাইল তৈরি করেন। জুপিটার মিসাইল হলো, বিশ্বের প্রথম লং-রেঞ্জ মিসাইল। তিনি একাধারে একজন বিজ্ঞানী, ডিজাইনার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রশাসক এবং টেকনোলজি ব্যবস্থাপক। তাকে 'আধুনিক রকেট ভুবনের জনক' বলা হয়ে থাকে। তিনি যখন ভারতে আসেন, তখন তার সাথে আমার সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়। আমি চেন্নাইয়ে তাকে স্বাগতম জানাই। সেখান থেকে তাকে থুম্বায় নিয়ে আসি। তিনি রকেট বিজ্ঞানীদের কাজের ধরণ নিয়ে আমাকে যা বলেছিলেন, তা এখনও আমার কানে বেজে ওঠে। তিনি বলেছিলেন, 'একটা কথা সবসময় মনে রাখবে, আমরা কেবল সফলতা দিয়ে নিজেদের গড়ে তুলি না, আমরা ব্যর্থতা দ্বারাও নিজেদের গড়ে তুলি।' এই পেশার মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং কাজের প্রতি নিষ্ঠা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'রকেটারির জন্য কেবল কঠোর পরিশ্রমই যথেষ্ট নয়। এটা কোনো খেলা নয় যে, কেবল কঠোর পরিশ্রমই তোমাকে সম্মান এনে দেবে। এখানে, শুধুমাত্র লক্ষ্য থাকলেই চলবে না, লক্ষ্যের পাশাপাশি সেই লক্ষ্য দ্রুত অর্জনের কৌশলও প্রয়োজন। দৃঢ় সংকল্প বলতে কেবল কঠোর পরিশ্রমকে বোঝায় না। দৃঢ় সংকল্প বলতে বোঝায়, তুমি তোমার কাজের সাথে কতটা জড়িত, তার মাধ্যমে। এর মধ্যে আবার লক্ষ্য নির্ধারণও আছে। দৃঢ় সংকল্প হলো, সামনে লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাওয়া, যার মাধ্যমে তোমার কাজের ফলাফল অসাধারণ হবে। সবকিছুকে ছাপিয়ে যাবে।'

আর আমার বিশ্বাস, তার পরবর্তী কথাগুলো আমি ঠিকই অনুসরণ করেছিলাম। 'রকেটারিকে কেবল তোমার পেশা বা জীবিকা হিসেবে চিন্তা কোরো না। রকেটারিকে নিজের ধর্ম, নিজের মিশন হিসেবে চিন্তা কর।'

জীবনের সেই সময়টাতে SLV প্রজেক্টের পেছনে আমি আমার সবটুকু বিলিয়ে দেই। আমি আমার ব্যক্তিগত সমস্যাগুলো কীভাবে সামলাব, তা শিখে ফেলি। আপনার লক্ষ্য অর্জনের পথে যে সকল সমস্যা দেখা দেয়, আপনার মস্তিষ্ক এভাবেই তার সমাধান করে থাকে। আমি বিশ্বাস করি যে, কোনো মিশনের সফলতা উপভোগ করার জন্য, এই সমস্যাগুলো থাকা উচিত।

আর আমার তৃতীয় শিক্ষা হলো, বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হয়ে, এর মোকাবিলা করা এবং এর থেকে শিক্ষা নেয়া। সবাই জানে যে, SLV-3-এর প্রথম পরীক্ষণ বিপর্যয়ে রূপ নেয়। কারণ সেই ভেহিক্যাল

সাগরে আছড়ে পড়ে। এই পরীক্ষণের প্রথম ধাপ সফল হয়। তবে দ্বিতীয় ধাপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। মাত্র ৩১৭ সেকেন্ডের জন্য ভেহিক্যালটি টিকে থাকতে সক্ষম হয়। আর চতুর্থ ধাপে ভেহিক্যাল-এর পে-লোডসহ, শ্রীহরিকোটা থেকে ৫৬০ কিলোমিটার দূরে সাগরে আছড়ে পড়ে।

আমার চোখের সামনে যে ঘটনা ঘটেছিল, আমার তা বিশ্বাস হচ্ছিল না। হ্যাঁ, এর আগেও আমি বহুবার ব্যর্থতার স্বাদ গ্রহণ করেছিলাম। তবে বছরের পর বছর হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর এমন ঘটনা পর্যবেক্ষণ করা, সত্যিই কষ্টদায়ক। আমার মাথার ভেতর একটি প্রশ্নই বারবার বেজে উঠছিল, "কোথায় ভুল হলো?' তবে আমি কোনো উত্তর পাচ্ছিলাম না। আমি শারীরিক এবং মানসিক, উভয়দিক দিয়েই চূড়ান্ত পর্যায়ে অবস্থান করছিলাম, আর এই সবকিছুই যখন বৃথা গেল, তখন নিজেকে বা আমার আশেপাশে যারা ছিল তাদেরকে আর বলার কিছু রইল না।

আমি কেবল তখন একটা জিনিস নিয়েই চিন্তা করতে পারছিলাম। তা হলো, 'ঘুম'। আমাকে আবারও সবকিছু নিয়ে বিশ্লেষণ শুরুর আগে অবশ্যই ঘুমিয়ে নিতে হবে। আমার মনে আছে, আমি অনেকটা সময় ঘুমিয়েছিলাম। ড. ব্রহ্ম প্রকাশ আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলেন। তখন তিনি আমার বস ছিলেন। তবে সেই মুহূর্তে তিনি ছিলেন আমার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী, যিনি আমাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে তার সাথে নিয়ে গেলেন। আমরা এক সাথে খাবার খেয়েছিলাম। খাওয়ার সময়টাতে তিনি লঞ্চিং ভেহিক্যাল নিয়ে একটা শব্দও তোলেননি। যদিও পরবর্তীতে বিশ্লেষণ এবং মিশন পুনরায় শুরু করা হয়। তবে সেই মুহূর্তে ছিলাম আমরা এমন দুজন লোক, যারা অভাবনীয় ক্লান্ত। তবে আমরা জানতাম, আমাদের ব্যর্থতা বৃথা যাবে না। আমরা জানতাম, সামনের দিনগুলোতে আমরা এর চেয়েও বড় সফলতা অর্জন করব। তবে সেই মুহূর্তে ড. ব্রহ্ম আমার সাথে যে ব্যবহার করেছিলেন, তা কেবল পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের সাথে করে থাকেন। যখন তাদের সন্তান কোনো প্রতিযোগিতা হেরে যায়। বাবা-মা তখন তাকে নিজ হাতে খাবার তুলে দেন। এবং তার পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে তাকে চিন্তা-ভাবনা করতে দেন।

আমরা SLV-3 প্রজেক্টে ঠিকই সফল হয়েছিলাম। এখান থেকে বিজ্ঞানের পথে আমার যাত্রা আরও গভীর থেকে গভীরতর পথ খুঁজে পায়। ISRO থেকে আমি DRDO-তে গেলাম। সেখানে আমি আমার দলের সাথে ভারতের প্রথম নিজস্ব মিসাইল, 'পৃথ্বি', 'ত্রিশূল', 'নাগ' এবং 'অগ্নি' তৈরি করলাম। সেগুলো কীভাবে তৈরি করা হয়েছিল, তার বর্ণনা এর আগেই আমি দিয়েছি। এই প্রজেক্টে কাজ করার সময় আমি, রকেটারি এবং বিজ্ঞানের নতুন ক্ষেত্র নিয়ে জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি, উদ্ভাবন করতে শিখে ফেলি। দক্ষভাবে নেতৃত্ব প্রদান আয়ত্ত করে ফেলি। সফলতা-ব্যর্থতা উভয়ের মুখোমুখি হতে শিখে ফেলি।

.

আমি এই গল্পগুলো কেন বলছি? কারণ আমার মনে হয়েছে এই ঘটনাবহুলতার মধ্যদিয়ে পার হতে গিয়ে এবং যে সকল লোকের সাথে আমি কাজ করেছি, তার মাধ্যমে আমি জীবনের প্রায় সকল ধরনের পরিস্থিতিরই মুখোমুখি হয়েছি। আমি সেই পরিস্থিতির মাঝে নিজের পথ করে নিতে

পেরেছি। আর আমার এই গল্প শুনে, অন্যরা যদি নিজেদের বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে, তাহলে আমি বুঝতে পারবে যে, আমি কেবল নিজের জন্য এতটা দীর্ঘ পথ পাড়ি দেইনি। অসংখ্য মানুষের জন্য দিয়েছি।

আমি এই মমতাময়ী দেশের একটি কূপ
আমি এ-দেশের তরুণ প্রজন্মের দিকে চেয়ে আছি
আমার কাছ থেকে নেবার অপেক্ষায়
চারিদিকে এক স্বর্গীয় মহিমা বিরাজ করবে
এবং তার আশির্বাদ ছড়িয়ে পরবে
যেমন করে এই কূপ থেকে পানি নেওয়া হবে।

এখনও অনেকটা পথ বাকি

মাই জার্নি : স্বপ্নকে বাস্তবতা প্রদান – এ পি জে আবদুল কালাম এখনও অনেকটা পথ বাকি

এখনও অনেকটা পথ বাকি

এই বইয়ের গল্পগুলো একান্তই আমার। গল্পগুলো যেই সকল লোকজন এবং মুহূর্ত নিয়ে, তাঁরা এবং সে সব ঘটনা আমার ওপর গভীর প্রভাব ফেলতে পেরেছে। যাঁদের স্পর্শে আমার জীবনের মুহূর্তগুলো পূর্ণতা পেয়েছে। এ-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কেউ যদি নিজের জীবনের স্মৃতিগুলো এবং মুহূর্তগুলো স্মরণ করে তবে শত শত না বলা গল্প রয়ে যাবে। বিশেষ করে, যদি কারো জীবন আমার মতো এত ঘটনাবহূল হয়, তার ক্ষেত্রে।

আমার মস্তিষ্কে বহু ঘটনা এখনও অব্যক্ত রয়েছে। ভারত সরকারের দ্বিতীয়বারের মতো পারমাণবিক প্রশিক্ষণকালে উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করা, অবসর গ্রহণ, শিক্ষকতার প্রতি আমার একাগ্রহ, প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমার দিনগুলো—এসব মিলিয়ে বহু চ্যালেঞ্জ এবং শিক্ষা আমি পেয়েছি।

অগ্নি এবং অন্যান্য মিসাইলগুলো সফল নিক্ষেপণের সাথে সাথে মিডিয়ার আলোতে প্রবেশের মাধ্যমে আমার জীবন থেকে পাওয়া শিক্ষাগুলো এবং আমার সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাকে আরো সতর্ক থাকতে হয়েছে। আমার অগ্রাধিকার লক্ষ্যগুলোও বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছে। প্রথমদিকে আমার কাজ ছিল কেবল করে যাওয়া এবং প্রয়োগ। আর এখন আমার কাজের অধিকাংশই হলো চিন্তা করা, লেখা এবং জীবনের বিভিন্ন স্তরের লোকজনের সাথে আলাপ আলোচনা করা।

বছর কেটে যাওয়ার সাথে সাথে আমি লক্ষ করলাম যে, এখন আমার মূল আগ্রহ হলো, তরুণ প্রজন্মের সাথে কথা বলার মাঝে। আমি বেশ কিছু বই লিখেছি, যেগুলো সাফল্য পেয়েছে। মূলত এর কারণ হলো, পাঠকদের উপলব্ধি। পাঠকরা আমাকে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে চেনেন, যার লক্ষ হলো ২০২০ সালে ভারতের গঠন, সেই ব্যক্তি তার মিশন অর্জনে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে এবং দেশব্যাপী তার ধারণা ছড়িয়ে দিচ্ছে।

আমার বই 'ভারত ২০২০', 'উইংস অব ফায়ার', 'ইউনাইটেড মাইনস' এবং বাকিগুলো দেশের পাঠক সমাজ যেভাবে গ্রহণ করেছে, তাতে আমি ভীষণ সন্তুষ্ট।

আমার লেকচার, আর্টিক্যাল, আলাপ-আলোচনা এবং বইয়ের মাধ্যমে নিজের ধ্যান-ধারণা প্রকাশের এবং দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের পাশাপাশি আমি বিভিন্ন প্রযুক্তির ওপর আগ্রহপ্রবণ হয়ে পড়েছি।

.

১৯৯০ সালে 'ইন্ডিয়ান ভিশন ২০২০'-এর কৌশল নির্ধারণে সাহায্যকালে আমার এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ হয়। আমাকে Forecasting and Assessment Council (TIFAC)-এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেয়া হয়। TIFAC-এর প্রথম মিটিং-এ আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে, ২০২০ সাল নাগাদ ভারতকে অর্থনৈতিকভাবে কীভাবে উন্নত করা যায়, সে বিষয়ের আমরা পরিকল্পনা প্রণয়ন করব। সে সময় বাৎসরিক জিডিপি বৃদ্ধির হার বছরে ৫ কি ৬ শতাংশ ছিল। আর আমরা চিন্তা করছিলাম কীভাবে এই বাৎসরিক জিডিপি বৃদ্ধির হার সর্বনিম্ন ১ শতাংশ করা যায়। এবং এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়। আর আমাদের মিশন পূরণ করতে হলে আমাদেরকে তাই করতে হবে। এই পরিকল্পনার কথা মাথায় রেখেই কাটগিলে উপস্থিত আমরা সবাই উত্তেজনা অনুভব করছিলাম।

আমরা বহু তর্ক-বিতর্কের পর সিদ্ধান্ত নিলাম যে, ১৭টি দল, মোট ৫০০ লোকবল নিয়ে কাজ করবে। যাদের কাজ হবে, অর্থনৈতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে জড়িত ৫০০ লোকের সাথে পরামর্শ করা। কমিটি দুই বছর কাজ করল এবং ১৯৯৬ সালের ২ আগস্ট নাগাদ তখনকার প্রধানমন্ত্রীর কাছে মোট ২৫টি রিপোর্ট পেশ করল। এটা একটা অসাধারণ ব্যাপার যে, কীভাবে বিভিন্ন বিভাগের লোকজন, একটি বিশেষ লক্ষ্যে জাতীয় উন্নয়নের জন্য একত্রে কাজ করল। TIFAC-এর কাজের পাশাপাশি আমি কৃষি এবং তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সম্পন্ন কাজগুলো সম্পর্কেও ওয়াকেবহাল থাকলাম। আমি ভীষণ আগ্রহ নিয়ে এই কাজ করতাম এবং এই ওয়াকেবহাল থাকার বিষয়টা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়।

.

দেশজুড়ে ভ্রমণ করে বেরিয়ে শিক্ষক, ছাত্র, প্রশাসক এবং কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে আমি বুঝলাম কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ নিয়ে কাজ করা হলো আমার কাজের প্রথম অংশ মাত্র। যখন কেউ তার

লক্ষ প্রকাশ করতে পারবে, এর ব্যাখ্যা দিতে পারবে এবং সেই লক্ষের পক্ষ নিয়ে তর্ক করতে পারবে, তখন সেটা লক্ষ জীবন ফিরে পাবে।

আমি এ রকমটা করতে চেয়েছিলাম, নাগরিকদের সাথে কথা বলে। আলোচনা করে। আমি যেখানেই গিয়েছি, সেখানেই মানুষজনের সাথে কথা বলেছি। আমি ভারতকে একটি জ্ঞানকেন্দ্রিক সমাজ হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছি। এমন একটি দেশ, যেখানে প্রযুক্তি মানুষকে শক্তি এনে দেবে। একই সাথে আমাদের আধ্যাত্মিক দিকটিও ভিন্ন মাত্রা পাবে।

আমি ২০০২-২০০৭ সাল পর্যন্ত ভারতের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করি। সেই সময়টা আমার জন্য বড় এক শিক্ষা হয়ে থাকবে। আমি যখন বুঝতে পারি, ভারত কত বড় এক বিস্ময়। মিডিয়া আমার নাম দিল "জনগণের প্রেসিডেন্ট'। দেশের বিভিন্ন জায়গায় আমাকে এই উপাধি দেয়া হয়। আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, এই উপাধিটি পেয়ে আমি সত্যিকার অর্থেই আনন্দ পেয়েছিলাম। যখন আমি আমার যাত্রা শুরু করলাম, আমি বেশিরভাগ সময়ই আমাদের এই অতুলনীয় দেশটি ঘুরে বেরিয়ে, এর মানুষগুলোকে বোঝার জন্য চেষ্টা করেছি। আমি দেখতে চেয়েছিলাম, দেশের কিছু অংশের মানুষের জীবনধারা কেমন। কীভাবে পরিবেশ তাদের জীবনকে গড়ে তুলেছে। তাদের সমস্যাগুলো কী? এবং এই সমস্যা কীভাবে সমাধান করা যায়। বলা হয়ে থাকে যে, প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি প্রাক্তন সকলের চাইতে বেশি ভ্রমণ করেছি। লক্ষদ্বীপ-এর পল্লী থেকে সুদূর উত্তরপূর্ব রাজ্য, সুদূর পশ্চিম অঞ্চল থেকে গভীর দক্ষিণাঞ্চল পর্যন্ত প্রায় সব জায়গায়ই আমি গিয়েছি। কেবল লক্ষদ্বীপে যাওয়া হয়নি। এবং সেখানে না যেতে পারার অনুশোচনা এখনও আমাকে ভোগায়। আমি সড়কপথে, আকাশপথে এবং রেলপথে তিনবার যাত্রা করেছি। রেলের প্রেসিডেন্সিয়াল বগি সকল প্রকার আধুনিক প্রযুক্তিতে সজ্জিত। যেখানে স্যাটালাইট এবং ডিপিএস সিস্টেমের সুবিধাও রয়েছে। সেই প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমি প্রতিটি কোণ থেকে আমার এই দেশটিকে দেখেছি। এই সুযোগ পাওয়ার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

এখন প্রশ্ন হলো : আমি বছরের পর বছর ধরে লাখো লাখো নারী-পুরুষ এবং শিশুদের সাথে দেখা করে কী শিখতে পেরেছি? আমি শিখেছি যে, সামাজিক জীব হিসেবে মর্যাদাবান ব্যক্তিদের নিয়ে আমাদের প্রশ্ন না করার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। খোলাখুলিভাবে প্রশ্ন করতে অনেকটা সাহস এবং নির্ভীকতার পরিচয় দিতে হয়। এমনকি স্কুল পড়ুয়া তরুণ ছাত্রদের ক্ষেত্রেও এ- কথা সত্যি। এর মানে এই নয় যে, তারা প্রশ্ন করতে চায় না। তারা দ্বিধা নিয়ে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করে, প্রশ্ন করার জন্য। একবার খালি প্রশ্ন করার সাহস দেখাতে পারলে, তাদের এই দ্বিধার বাঁধ ভেঙে যায়। তার জায়গায় আগ্রহ এবং কৌতূহল স্থান করে নেয়। আমাকে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, মহাকাশ, শিল্পকলা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, কেন আমি জীবনে বিয়ে করিনি। এমনকি এ-নিয়েও প্রশ্ন থাকে যে, আমার চুল কাটার ধরণ এমন কেন?

আমি প্রতিটি প্রশ্নেরই জবাব দেয়ার চেষ্টা করি। যতটা বর্ণনা এবং বিশদ বিবরণ দেয়া সম্ভব দেয়ার চেষ্টা করি। আমি তাদেরকে জানাই যে, আমি নিজেও একজন অন্তর্দ্বন্দ্বকারী। তাদের কাছ থেকেও আমার অনেক কিছু জানার আছে। আমি বুঝতে পারি, একজন ভারতীয় বলতে কী বোঝায়। আমি

বুঝতে পেরেছি, আমাদের নিজস্ব জীবনধারা নির্বাহ করার মাধ্যমে আমরা কীভাবে সমাজ গঠন করেছি। আমি এ-ও বুঝতে পেরেছি যে, এই বোধগম্যতা দিয়ে কী হয়।

.

আমার প্রেসিডেন্ট জীবনের সময়কাল অনেক ধরনের রাজনীতি ঘটনাবহুলতায় পরিপূর্ণ। সে সম্পর্কে বিবরণ আমি আমার বই 'টার্নিং পয়েন্টস'-এ দিয়েছি। দেশের সাংবিধানিক সর্বোচ্চ পদে থাকার জন্য, আমি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত হই। কীভাবে সংসদ এবং বাকি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কাজ করে এবং একজন প্রেসিডেন্ট কীভাবে পরিবর্তন সাধন করতে পারে, এ-নিয়ে আমি বহু চিন্তা-ভাবনা করতাম।

আমার দায়িত্ব শেষ হলে আমি খুশিমনে আমার শিক্ষকতার পেশায় ফিরে যাই। এবং সেই পেশার কারণেই আমাকে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেরাতে হয়। আমি প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকতাম শিক্ষকতা এবং আমার প্রিয় প্রজেক্ট 'ইন্ডিয়ান ২০২০' এবং Providing Urban Amenities in Rural Areas (PURA) নিয়ে। আমি বহু শিক্ষার্থীর সাথে পরিচিত হতাম। দেশে এবং বিদেশের বিচিত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজ করে যাচ্ছিলাম এবং একই সাথে জাতীয় ক্ষেত্রেও অবদান রাখার চেষ্টা করছিলাম। আমি বহু প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রমণ করেছি। সেখানকার শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলেছি এবং তাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য বৃহৎ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিয়েছি।

তারা আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করত। তারা কোন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জন করবে, সেসব থেকে শুরু করে তাদের জেলা বা শহরের অবকাঠামো নিয়ে পর্যন্ত প্রশ্ন করত। এই বই আমার জীবনধারা সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য লেখা নয়। এ-কাজ আমি আগেই করেছি। এই ছোট বইটি হলো, আমার লম্বা রাস্তার মাঝে ছোট একটি বিশ্রামকেন্দ্রের মতো। এটি মূলত এমন একটি জায়গা যেখানে হাইওয়ের পাশে আপনি বসে আছেন এবং অন্যান্য পথচারীকে পার হয়ে যেতে দেখছেন এবং আপনি বিশ্রাম নিচ্ছেন। এই বইকে এভাবেও বলা যায় যে, আমার লম্বা রেল ভ্রমণের মাঝে ছোট্ট একটু বিশ্রামের সময়। মাদ্রাজ থেকে দেরাদুনে এক সময় ভ্রমণ করার সময় যে বিশ্রাম আমি গ্রহণ করতাম। এবার আমার চোখ কেবলমাত্র লক্ষ্যের দিকেই নিবন্ধ নয়। এবার আমি পেছনে ফিরে তাকিয়ে আমার মন্ত্রমুগ্ধ জীবনের সূচনার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হব। আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার বাবা নারকেল হাতে বাড়ি ফিরছেন। তার মাথায় চলছে সৃষ্টিকর্তার প্রার্থনা। আমি আমার মায়ের হাতের নড়াচড়াও দেখতে পাচ্ছি। মা কি করে আমাদের জন্য নারকেলের চাটনি এবং বিভিন্ন খাবার তৈরি করছেন। আর আমি খাবারের অপেক্ষায় রান্না ঘরে মেঝেতে বসে অপেক্ষা করছি। আমি আমার চোখ বন্ধ করলেই শুনতে পাচ্ছি, রামেশ্বরামে সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন এবং বাতাসের তাণ্ডব। কীভাবে সাইক্লোন রামেশ্বরামে আঘাত হানল। সংবাদপত্র বিলি করতে করতে আমার পায়ের ক্লান্তি, আমি অনুভব করতে পারছি এবং কীভাবে পাঠকদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে বের হতাম-তাও দেখতে পাচ্ছি পরিষ্কারভাবে। আমি পরিষ্কারভাবে আমার বাবার কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি। তিনি আমাকে বলছেন,

‘তোমাকে বড় কিছু হতে হলে এখান থেকে দূরে যেতে হবে। সীগাল কী গৃহহীনভাবে সূর্যের কাছে যাওয়ার জন্য আকাশে উড়ে না? তোমাকে পরিবারের মায়া কাটিয়ে উঠতে হবে। নিজের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য দূর-দূরান্তে যেতে হবে। আমাদের ভালোবাসা তোমাকে অন্ধ করে দেবে না। আমাদের প্রয়োজনও তোমাকে বেঁধে রাখবে না।’

.

এই বিশ্রামকেন্দ্রে আমি আমার সহযাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করছি। যাদের সাথে আমি আরেকবার পথ চলতে পারব। লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, ইয়াদুরাই সলোমন, আহাম্মদ জালালউদ্দীন, ড. ভিকরম সারাভাই—যাঁরা আমাকে গড়ে তুলতে এবং বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছেন এবং চিন্তাভ-বন গড়ে দিয়েছেন। তাঁদের সাথে আবারও পথ চলতে চাই আমি। তাঁদের গল্প বলতে গিয়ে, তাঁদের হারানোর বেদনা আমি আরো গভীরভাবে অনুভব করতে পারছি। তাঁরা আমাকে ছেড়ে চলে যাবার পরও তাদের স্মৃতি আমার সাথেই রয়ে গেছে। আর আমার প্রিয় পাঠকেরা, আমি যখন এই সব মহৎ লোকের গল্প আপনাদেরকে শুনিয়েছি, তখন আপনারা নিশ্চয়ই এঁদের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পেরেছেন? তাঁরা কীভাবে আমার জীবনে এসেছিলেন, তাও নিজের কল্পপটে দেখতে পেয়েছেন। চিন্তা-চেতনা এবং জ্ঞান-বুদ্ধির আদান-প্রদান-আনন্দ এবং রাজনীতির বক্র জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা, পড়ালেখা, আবেগ, ক্ষমাশীলতা-এসবই আমার জীবনের অংশ। আমি পুরো বিশ্বের সামনে আমার জীবনকে তুলে ধরলাম। যেকোনো পূর্ণ জীবনই চিন্তা এবং আবেগ-অনুভূতির সমন্বয়ে গঠিত। তাই আমার জীবন সম্পর্কে পড়ে অনেক পাঠকেরই হয়তো স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার স্পৃহা জেগে উঠবে, সহযোগিতা করবে দেশ- জাতির জন্য নতুন কিছু গড়ে তুলতে। আমি বিশ্বাস করি, জীবন নামক বিরাট নাট্যমঞ্চে আমি আমার ক্ষুদ্র ভূমিকাই পালন করেছি। আমার নিয়তি আমাকে পালন করিয়েছে।